POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا

মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারাও পিতা নহে, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসুল এবং নবীগণের মোহর, এবং আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী

(সূরা আহযাব, আয়াত: ৪১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 30-31

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 27 July-3 Aug, 2023 8-15 মহররম 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

সীরাতুন্নাবী (সা.) সংখ্যা

নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.), তাঁর বংশধর এবং সাহাবাদের উপর আশিস ও কল্যাণ বর্ষিত হোক, যার মাধ্যমে পথহারা গোটা বিশ্বকে খোদা সরল পথে পরিচালিত করেছেন। তিনিই পৃষ্ঠপোষক ও হিতসাধনকারী, পথহারা সৃষ্টিকে যিনি পুনরায় সরল পথে ফিরিয়ে এনেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

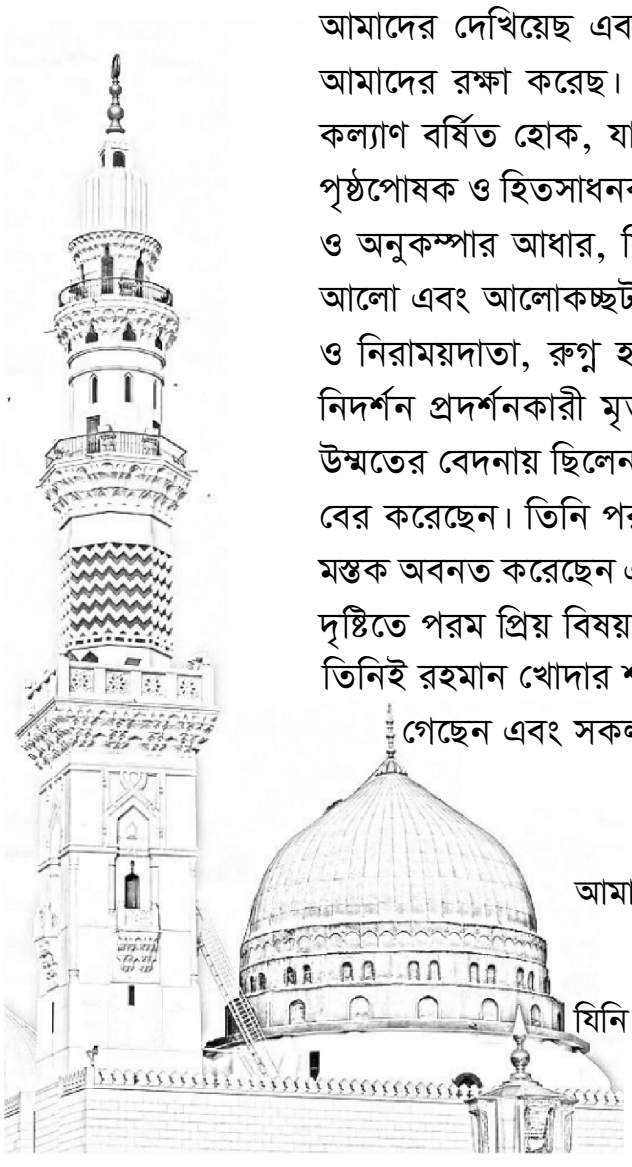

'হে প্রভু! সহস্র-সহস্র কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য তোমারই প্রাপ্য। কেননা, তোমাকে চেনার পথ তুমি নিজেই আমাদের দেখিয়েছ এবং স্বীয় পবিত্র গ্রন্থাদি অবতীর্ণ করে চিন্তা-ভাবনা ও বোধ-বুদ্ধির ভুলভ্রান্তি থেকে আমাদের রক্ষা করেছ। নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.), তাঁর বংশধর এবং সাহাবাদের উপর আশিস ও কল্যাণ বর্ষিত হোক, যার মাধ্যমে পথহারা গোটা বিশ্বকে খোদা সরল পথে পরিচালিত করেছেন। তিনিই পৃষ্ঠপোষক ও হিতসাধনকারী, পথহারা সৃষ্টিকে যিনি পুনরায় সরল পথে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি অনুগ্রহশীল ও অনুকম্পার আধার, যিনি মানুষকে শিরক ও প্রতিমাপূজার কলুষ থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি মূর্তিমান আলো এবং আলোকচ্ছটা যিনি পৃথিবীতে একত্ববাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত করেছেন। তিনি যুগের চিকিৎসক ও নিরাময়দাতা, রুগ্ন হৃদয়কে যিনি সততা ও সরলতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সেই সম্মানিত নিদর্শন প্রদর্শনকারী মৃতদের যিনি মৃতদের জীবনসুধা পান করিয়েছেন। তিনি দয়ালু ও স্নেহশীল, যিনি উম্মতের বেদনায় ছিলেন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তিনিই সেই বীরপুরুষ, যিনি আমাদের মৃত্যুর গহ্বর থেকে টেনে বের করেছেন। তিনি পরম সহনশীল ও নিঃস্বার্থ এক সত্তা যিনি (খোদার প্রতি) পূর্ণ দাসত্বের স্বাক্ষর রেখে মস্তক অবনত করেছেন এবং আপন সত্তাকে বিলীন করেছেন। তিনি খাঁটি একত্ববাদী, তত্ত্বজ্ঞানের সমুদ্র, যাঁর দৃষ্টিতে পরম প্রিয় বিষয় হল খোদার প্রতাপ, যাঁকে ছাড়া বাকি সব কিছু ছিল তাঁর দৃষ্টিতে অর্থহীন। তিনিই রহমান খোদার শক্তির নিদর্শন, কেননা, নিরক্ষর হয়েও ঐশী জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন এবং সকল জাতিকে তাদের ভুলভ্রান্তির জন্য অভিযুক্ত করেছেন।'

در دلم جوشد ثنائے سرورے آنکہ در خوبی ندارد ہمسرے

আমার হৃদয় সেই নেতার প্রশংসায় উদ্বেলিত গুণাবলীর ক্ষেত্রে যার কোন জুড়ি নেই।

آفتاب ہر زمین و ہر زمان رہبر ہر اسود و ہر احمرے

যিনি সমগ্র বিশ্ব ও সকল যুগের সূর্য যিনি প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের পথপ্রদর্শক।

(বারাহীনে আহমদীয়া ১ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

রসুল করীম (সা.) এর প্রতি সাহাবাগণের প্রেমানুরাগ

আনসার ও মুহাজির সাহাবাগণের নিকট প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব এমনই ছিল যার উপমা হিসেবে বলা যায় তিনি (সা.) ছিলেন এক প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ আর সাহাবাগণ তাঁর চারপার্শ্বে ভিড় জমিয়ে রাখত, যেন তারা পতঙ্গপাল। সাহাবাগণ তাঁর উপর নিজেদের মন ও প্রাণ উজাড় করে দিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর প্রতিটি আহ্বানে সাড়া দিতেন এবং তাঁর ছায়া-সঙ্গী হয়ে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আবার প্রিয় নবী (সা.)-এর খোদা প্রদত্ত প্রতাপ ও অত্যুজ্জ্বল চেহারার কারণে তাঁকে দু' চোখভরে দেখার ক্ষমতাও ছিল না, তাঁরা আঁ হযরত (সা.) কে প্রশ্ন করতে সংকোচ করতেন এবং অপেক্ষা করতেন, কোন এক গেঁয়ো বেদুঈন এসে জিজ্ঞাসা করুক যাতে তারাও শুনতে পান। তাঁদের নিকট আঁ হযরত (সা.) ছিলেন জগতের যে কোন বস্তুর থেকে মূল্যবান। তাঁরা যে কোন পরিস্থিতিতে তাঁর কাছ থেকে পৃথক হতে চাইতেন না, তাঁকে হারাতে চাইতেন না আর একথা প্রত্যেক মহিলা, পুরুষ, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ ও শিশুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাঁর মৃত্যুর পর সাহাবগণ প্রবল মর্মযাতনায় উন্মাদ প্রায় হয়ে পড়েছিলেন। শোকের অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে, হযরত উমর (রা.) এর ন্যায় বীরপুরুষও মুষড়ে পড়েছিলেন, তিনি চলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন আর তাঁর পা দু'টি শরীরের ভার নিতে পারছিল না। হুস্‌সান বিন সাবিত (রা.) এর এই পঙক্তিটিতে সাহাবাগণের অবস্থার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে।

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِيْ فَعَمِيَ عَلَيْكَ النَّاظِرُ ☆ مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ

অর্থাৎ হে মহম্মদ! তুমি আমার নয়নের মণি ছিলে। তোমার মৃত্যুতে আমার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন যে মরে মরুক, আমি তো কেবল তোমারই মৃত্যু নিয়ে শঙ্কিত ছিলাম।' হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একবার মসজিদ মুবারকে পায়চারি করছিলেন এবং হুসসান বিন সাবিত (রা.) এর এই পঙক্তিটি পাঠ করে তাঁর প্রিয় প্রভু হযরত মহম্মদ (সা.)কে স্মরণ করে অঝোর নয়নে কেঁদে চলেছিলেন। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এই পঙক্তিটি যদি আমার মুখ নিয়ে নিঃসৃত হত! নিম্নে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি সাহাবাগণের প্রেমানুরাগের অক্ষয় উপাখ্যান থেকে কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করা হলঃ

৪ঠা হিজরী সনের সফর মাসে আজাল ও কারাহ গোত্রের কিছু মানুষ আঁ হযরত (সা.)এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল- আমাদের গোত্রের অনেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট। আপনি কয়েকজনকে আমাদের সঙ্গে রওনা করুন যারা আমাদেরকে মুসলমান বানাবে এবং ইসলামের শিক্ষা দিবে। আঁ হযরত (সা.) তাদের বাসনার কথা জানতে পেরে আনন্দিত হন এবং দশজন সাহাবার একটি দলকে তাদের সঙ্গে রওনা করে দেন। কিন্তু যেমনটি পরে আমরা জানতে পারব যে, এরা ছিল মিথ্যাবাদী আর বনু লাইহান এর প্ররোচনায় তারা মদীনায় এসেছিল যারা তাদের নেতা আবু সুফিয়ান বিন খালিদ এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে এই ষড়যন্ত্র রচনা করেছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল এই অজুহাতে মুসলমানরা মদীনার বাইরে পা রাখলেই তাদের উপর আক্রমণ করা হবে আর বনু লাইহান এই কাজের বিনিময়ে আজাল ও কারাহ গোত্রের মানুষদের জন্য অনেকগুলি উট পুরস্কার হিসেবে ধার্য করেছিল। আজাল ও কারা গোত্রের এই কুচক্রীরা যখন আসফান ও মক্কার মাঝামাঝি পৌঁছল, তখন তারা আবু লাইহানকে চুপিসারে এই সংবাদ পাঠালো যে, মুসলমানরা তাদের সঙ্গে আসছে, তারাও যেন চলে আসে। এই সংবাদ পেয়ে বনু লাইহান গোত্রের দু'শ যুবক- যাদের মধ্যে একশ জন তিরন্দাজ ছিল, মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করতে করতে রাজী নাম স্থানে তাদের ধরে ফেলে। সাহাবাগণ একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর আরোহন করে তাদের মোকাবেলা করেন। দশজনের মধ্যে সাতজন শহীদ হয়ে যান। আর খুবায়েব বিন আদ্দি, যায়েদ বিন উসনা এবং আব্দুল্লাহ্ বিন তারিককে তারা মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে নীচে নামতে রাজি করায়। তারা বলে, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। কিন্তু তাঁরা নেমে আসা মাত্রই তাদের বন্দী বানিয়ে নেয়। আব্দুল্লাহ্ যেতে অস্বীকার করলে আব্দল্লাহকে পথেই তারা হত্যা করে। বনু লাইহানের প্রতিশোধ পূর্ণ হয়েছিল। এখন তারা কুরায়েশদের তুষ্ট করার জন্য এবং অর্থলোভে খুবায়েব এবং যায়েদকে সঙ্গে করে মক্কা অভিমুখে রওনা হয়। মক্কা পৌঁছনোর পর তারা তাদেরকে কুরায়েশদের হাতে বিক্রি করে দেয়। খুবায়েবকে হারিস বিন আমির বিন নওফিল এর ছেলেরা কিনে নেয়। কেননা, খুবায়েব বদরের যুদ্ধে হারিসকে হত্যা করেছিলেন। আর যায়েদকে কিনে নেয় সাফওয়ান বিন উমাইয়া।খুবায়েব এবং যায়েদ-এই দুইয়ের শাহাদতের ঘটনা অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক। সাফওয়ান বিন উমাইয়া তার বন্দী যায়েদ বিন উসনাকে সঙ্গে নিয়ে হারামের বাইরে যায়। কুরায়েশ নেতাদের দল সঙ্গে ছিল। বাইরে পৌঁছে সাফওয়ান তার ক্রীতদাস নাসতাসকে আদেশ দেয় যায়েদকে হত্যা করার। নাসতাস এগিয়ে এসে তরবারি হাতে নেয়। সেই সময় প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারব এগিয়ে আসে যায়েদকে বললেন- 'সত্যি করে বল, তোমার কি ইচ্ছে করে না এই মুহূর্তে তোমার স্থানে আমাদের হাতে মহম্মদ থাকত যাকে আমরা হত্যা করতাম আর তুমি বেঁচে যেতে এবং তুমি স্ত্রী-পরিবারের সঙ্গে সুখে দিন যাপন করতে?" যায়েদের চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ল। প্রচণ্ড ক্রোধের স্বরে তিনি বললেন, 'আবু সুফিয়ান এটা তুমি কি বলছ? খোদার কসম! আমি এটাও পছন্দ করি না যে আমার প্রাণরক্ষার বিনিময়ে রসুলুল্লাহ্‌র পায়ে একটা কাঁটাও বিঁধুক।' আবু সুফিয়ান অবলীলায় বলে উঠলেন- 'আল্লাহ্‌র কসম আমি কোন ব্যক্তিকে কাউকে এমনভাবে ভালবাসতে দেখি নি যেভাবে মহম্মদের সঙ্গীরা মহম্মদকে (সা.) ভালবাসে।'

এরপর নাসতাস যায়েদকে শহীদ করে দেয়।

(সীরাত খাতামানুবীঈন, পৃ: ৫১৩-৫১৬)

ইসলামী সেনাবাহিনী মদিনার দিকে রওনা হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে রসুলে করীম (সা.)-এর শাহাদের গুজব এবং ইসলামী সেনাবাহিনী পর্যূদস্ত হওয়ার খবরাদি মদীনায় ছড়িয়ে পড়ল। মদীনার মহিলা এবং ছেলে মেয়েরা পাগলের মত ছুটতে লাগল ওহোদের প্রান্তরের দিকে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই পথিমধ্যে সঠিক খবর পেয়ে থেমে গেল। বনী দিনার গোত্রের এক মহিলা উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে ওহোদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি উন্মাদীনির মত যুদ্ধক্ষেত্রে দিকে দৌড়াচ্ছিলেন। তাঁর স্বামী, ভাই ও পিতা ওহোদে নিহত হয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁর এক ছেলেও নিহত হয়েছিলেন। তাঁকে তাঁর পিতার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হলো তখন তিনি বললেন, 'রসুল করীম (সা.)এর খবর কি? সংবাদাতা যেহেতু জানতেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) জীবিত আছেন, সেহেতু তিনি ঘুরে ফিরে মহিলাকে তাঁর ভাই, তাঁর স্বামী ও ছেলের মত্যর খবরই দিচ্ছিলেন। কিন্তু মহিলাও ঘুরে ফিরে শুধু একই কথা বলছিলেন "مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" 'রসুলুল্লাহ্ (সা.)! এটা আপনি কি করলেন? ' বাহ্যিকভাবে কথাটিকে ভ্রমাত্মক মনে হয়। এবং এ জন্যই ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, কথাটার অর্থ ছিল- 'রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবস্থা কি?' কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, কথাটা ভ্রমাত্মক ছিল না। স্ত্রী লোকদের ভাবাবেগ বেশি এবং তারা কোন কোন সময় মৃত ব্যক্তিকে ধরে নিয়েই তাকে সম্বোধন করে কথা বলে। যেমন, অনেক স্ত্রীলোক ছেলে মারা গেলে তার লাশকে সম্বোধন করে বলে , 'আমাকে ফেলে গেলে। এই বুড়ো বয়সে কেন আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে'। এটা শোকাভিভূত মনুষের প্রকৃতির একটা সূক্ষ্ম প্রকাশ মাত্র। তাই , রসুল করীম (সা.) এর মৃত্যুর খবর শুনে ঐ মহিলার অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল। কিছুতেই তিনি তাঁকে (সা.) মৃত ভাবতে পারছিলেন না। এবং অপরদিকে সত্যতা ঠিক যাচাইও করতে পারছিলেন না। এ জন্যও শোকার্ত অর্থে ঐ কথাই বলছিলেন যে, হে রসুলুল্লাহ্ (সা.) আপনি এটা কি করলেন? অর্থাৎ এমন বিশ্বস্ত ও দয়ালু ব্যক্তি আমাদেরকে এত বড় দুঃখ কি করে দিলেন?

লোকেরা যখন দেখলেন যে, মহিলার বাপ, ভাই এর কোন তোয়াক্কা নেই, তখন তাঁরা তাঁর প্রকৃত অনুভূতি বুঝতে পারলেন এবং তাঁকে বললেন, 'অমুকের মা। তুমি যেমন চাচ্ছ, রসুল তেমনই আল্লাহ্‌র ফযলে ভালই আছেন। ' এতে মহিলা বললেন, 'দেখাও তিনি কোথায়?' লোকেরা বলল, 'সামনে এগিয়ে যাও, পাবে, তিনি ঐ, ঐখানে দাঁড়িয়ে আছেন।' মহিলা এক দৌড়ে রসুল (সা.)এর কাছে পৌঁছে গেলেন। এবং তাঁর আচল ধরে বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত, আপনি যখন ভাল আছেন, তখন আমি আর কারো জন্য চিন্তা করি না। '

এই তো সেই ঈমানের দৃষ্টান্ত যা পুরুষরা দেখিয়েছিলেন যুদ্ধে! নারীরা যুদ্ধের ময়দানে যে আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তার কিছু আমি তুলে ধরলাম।

খৃষ্টান জগত মরিয়ম মগদীলিনীর এবং তার সাথীদের সেই বাহাদুরীতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে যে, তারা খুব ভোরে শত্রুদেরকে লুকিয়ে মসীহ (আ.) এর কবরের কাছে গিয়েছিলেন। আমি তাদের বলতে চাই যে, এসো এবং আমার প্রিয়তমের (সা.) একনিষ্ঠ ও আত্মনিবেদিত অনুসারীদেরকে দেখ! কি অবস্থার মধ্যে তাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং কি অবস্থায় তাঁরা তৌহিদের পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন।

এই ধরণের আত্মোৎসর্গের আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে ইতিহাসে। যখন রসুল করীম (সা.) শহীদগণের দাফনের কাজ সমাধা করে মদিনায় ফিরে আসছিলেন, তখন আবারাও নারীরা এবং ছেলেমেয়েরা শহরের বাইরে আসে তাঁকে স্বাগত জানাতে। রসুলে করীম (সা.) এর উটনীর লাগাম ধরে আসছিলেন মদীনার এক নেতা সায়াদ বিন মোয়ায। এবং তিনি দুনিয়ার সামনে এই কথা বলছেন, দেখ, আমরা মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে ঠিকমত ঘরে নিয়ে এসেছি। শহরের কাছাকাছি এলে তাঁর বৃদ্ধা মা, যাঁর দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হয়ে

এরপর ২৩ পাতায়....

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	২
খুতবা জুমআ হুযুর আনোয়ার (আই.)	৩
আঁ হযরত (সা.) এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত	৮
পৃথিবীর পরিত্রাতা	৯
খাতামান্নাবীঈন (সা.)	১২
শান্তি প্রতিষ্ঠার আলোকে আঁ হযরত (সা.)এর জীবনী।	১৫
সাহাবাগণের জীবনী- হযরত আবু বকর ও হযরত নুর উদ্দীন (রা.)	২১

জুমআর খুতবা

বর্তমানে এমন যুগ এসেছে যখন মানুষ ইসলাম এবং ঈমানের খাতিরে কুরবানী করাথেকে বাঁচার জন্য অজুহাত খুঁজে বেড়ায় আর সময় এলে বলে, আমাদের এই সমস্যা ও সেই প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাবে মুসলমানদের মাঝে কুরবানীর এমন স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে পুরুষ এবং সাবালিকা মহিলাদের কথা তো বাদই দিলাম, কিশোররাও এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিল

কেবল দু'জন ব্যক্তি ছিল যারা এ অভিযানে অংশগ্রহণ করতে ইতস্তত করেছিল। আর তারা ছিল আবু লাহাব ও উমাইয়্যা বিন খালফ। তাদের এই ইতস্ততা মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতার কারণে ছিল না। বরং আবু লাহাব তার বোন আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্নকে ভয় পাচ্ছিলো, যা সে যমযম-এর (মক্কায়) আগমনের মাত্র তিন দিন পূর্বে কুরাইশের নিপাত হওয়া সম্পর্কে দেখেছিল। আর উমাইয়্যা বিন খালফ তার মৃত্যু সংক্রান্ত মহানবী (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে ভীতত্রস্ত ছিল আর হযরত সা'দ বিন মুআযের মাধ্যমে সে (মক্কায়) এ সংবাদ পেয়েছিলো।

আবু লাহাবও যুদ্ধে যেতে ভীতত্রস্ত ছিল। সে নিজের স্থলে অন্য একজনকে পাঠিয়েছিল, নিজে যুদ্ধে যায়নি। আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্নই ছিল তার যুদ্ধে না যাওয়ার (মূল) কারণ। সে বলতো, আতেকার স্বপ্ন হাত থেকে কোনো বস্তু গ্রহণ করার মতো বিষয় অর্থাৎ সুনিশ্চিত কথা।

মহানবী (সা.) তো উমাইয়্যা বিন খালফ-এর ভাই, উবাই বিন খালফ ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করেননি। তাকে তিনি (সা.) উহুদের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। ব্যাখ্যাকারীগণ আরো বলেন, হযরত সা'দ (রা.) উমাইয়্যাকে হয়ত কেবল কথাই বলে থাকবেন যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথীরাতোমাকে হত্যা করবে। কেননা যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে আর রেওয়ায়েতে এটিও আছে যে, তিনি কিংবা তাঁর (সা.) সাথীরা তাকে হত্যা করবেন।

আরবের মেলার স্থানসমূহের মাঝে অন্যতম একটি ছিল

এক বর্ণনা অনুযায়ী মুসলিম সেনাবাহিনীর নিকট তিনটি পতাকা ছিল।

মুহাজিরদের পতাকা ছিল হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র নিকট, খাযরাজ গোত্রের পতাকা ছিল হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.)'র নিকট এবং অওস গোত্রের পতাকা ছিল হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র নিকট।

মক্কা থেকে যাত্রার পূর্বে কুরাইশরা কাবা শরীফে গিয়ে দোয়া করে যে, হে খোদা! আমাদের উভয় দলের মাঝে যে দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তোমার দৃষ্টিতে অধিক ভালো ও অধিক উত্তম তুমি তার সাহায্য করো আর অপর দলকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করো।"

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৬ ই জুন, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (১৬ শাহাদত ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মক্কার কাফেরদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির বৃত্তান্ত কিছুটা তুলে ধরা হয়েছিল। এর কিছুটা বিস্তারিত চিত্র হলো, উমাইয়্যা বিন খালফ নামে এক ব্যক্তি ছিল আর আরেকজন ছিল আবু লাহাব। (মক্কায়) যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল তখন তারা যুদ্ধে যেতে কিছুটা ইতস্তত করেছিল। এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে যে, কুরাইশ নেতারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাবি ও চেষ্টা করছিল, কিন্তু উমাইয়্যা বিন খালফ যুদ্ধে যেতে অনীহা দেখাচ্ছিল।

মক্কার এক নেতা উকবাহ্ বিন আবু মুআয়েত উমাইয়্যার কাছে আসে এবং তার সামনে সুগন্ধিপাত্র ও ধূপকাঠি রেখে বলে, হে আবুল আলা! তুমি মহিলাদের সুগন্ধির ঘ্রাণ নাও কেননা তুমিও মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত, যুদ্ধের সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক?

(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২২)

আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে আবু জাহল উমাইয়্যার কাছে আসে এবং তাকে বলে, তুমি মক্কার নেতা এবং সম্মানিত লোকদের একজন। যদি লোকেরা তোমাকে যুদ্ধ থেকে পিছু হটতে দেখে তাহলে তারাও যাবে না। তাই এক দু'দিনের দূরত্বই হোক তুমি অবশ্যই আমাদের সাথে চলো; এরপর না হয় ফিরে এসো। উমাইয়্যা মূলত যুদ্ধে যেতে একারণে ভীত ছিল যে, তার নিহত হওয়ার বিষয়ে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং এ বিষটি তার জানা ছিল। যেমন বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ বিন মুআয উমরার উদ্দেশ্যে (মক্কায়) যান এবং তিনি উমাইয়্যা বিন খালফের বাড়িতে অবস্থান করেন। উমাইয়্যার সাথে তার পূর্ব পরিচয় ছিল। উমাইয়্যার অভ্যাস ছিল, যখন সিরিয়া অভিমুখে যেত এবং মদিনার (পাশ দিয়ে) যেতো তখন হযরত সা'দ এর বাড়িতে অবস্থান করত। উমাইয়্যা হযরত সা'দ (রা.)-কে বলে, একটু অপেক্ষা করো। তিনি উমরা করতে চাচ্ছিলেন। সে বলে, আপাতত কিছুটা অপেক্ষা করো। দুপুরবেলা মানুষজন যখন অন্যমনস্ক থাকবে তখন গিয়ে তওয়াফ করে নিও। মুসলমানদের বিরোধিতার কারণে এই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। দ্বিপ্রহরে যখন হযরত সা'দ (রা.) তওয়াফ করছিলেন তখন তিনি আবু জাহলকে দেখতে পান। সে (আবু জাহল) বলতে থাকে, তওয়াফকারী কে? হযরত সা'দ বলেন, আমি সা'দ। আবু জাহল বলে, তুমি কি মনে করো, নিরাপদে কাবাগৃহ তওয়াফ করবে অথচ তুমি মুহাম্মদ (সা.) এবং তার সাথীদের আশ্রয় দিয়েছো? হযরত সা'দ বলেন, হ্যাঁ। এরপর তারা উভয়ে পরস্পরকে গালমন্দ করে (অর্থাৎ আবু জাহল তাকে চ্যালেঞ্জ দেয় যে, তুমি কীভাবে তওয়াফ করতে পারো; তুমি তো মুহাম্মদ (সা.)-কে আশ্রয় দানকারীদের একজন। যাহোক তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি আশ্রয়ও দিয়েছি আর আমি (কা'বা) তওয়াফও করব। তারা পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। উমাইয়্যা হযরত সা'দকে বলে, হে সা'দ! আবুল হাকাম (এটি আবু জাহলের ডাকনাম ছিল) এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বোলো না, কেননা সে এ উপত্যকাবাসীর নেতা। হযরত সা'দ বলেন, খোদার কসম! যদি তুমি বায়তুল্লাহ্

তওয়াফ করতে আমাকে বাধা দাও তাহলে আমি (তোমাদের জন্য) এর চেয়েও কঠিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করব। আর তা হলো, তোমাদের বাণিজ্যিক পথ, যা মদিনার পাশ ঘেঁষে অতিক্রম করে,অর্থাৎ সিরিয়াগামী বাণিজ্যিক পথ বন্ধ করে দেবো। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলতেন, উমাইয়্যা হযরত সা'দ (রা.)-কে একথাই বলতে থাকে যে, উচ্চস্বরে কথা বোলো না এবং তাকে থামানোর চেষ্টা করতে থাকে। হযরত সা'দ (রা.) রাগান্বিত হয়ে উমাইয়্যাকে বলেন, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও এবং তার সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব কোরো না। অর্থাৎ আবু জাহলকে সমর্থন কোরো না।

আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি (সা.) বলতেন, তিনি তোমাকে হত্যা করবেন; অর্থাৎ তোমার নিহত হবার ভবিষদ্বাণী করেছেন। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তারা অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথীরা তোমাকে হত্যা করবে। উমাইয়্য জিজ্ঞেস করে, আমাকে? হযরত সা'দ (রা.) বলেন , হ্যাঁ ! তোমাকে। এরপর উমাইয়্যা তাকে জিজ্ঞেস করে, মক্কাতে? হযরত সা'দ বলেন, তা আমি জানি না। এ কথা শোনার পর উমাইয়্যা বলে, খোদার কসম ! মুহাম্মদ (সা.) যখন কোনো কথা বলেন তখন তিনি মিথ্যা কথা বলেননা। এরপর সে তার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে এবং তাকে বলে, আমার "ইয়াসরেবী" ভাই আমাকে কি বলেছে, তুমি কি তা জানো? সে জিজ্ঞেস করে, কি বলেছে? উমাইয়্যা বলে, সে নাকি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছে যে, তিনি বলেছেন, তিনি আমাকে হত্যা করবেন। তার স্ত্রী বলে, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ (সা.) মিথ্যা কথা বলেন না। এটি সেই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যার কারণে উমাইয়্যা ভীতত্রস্ত ছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়া এড়াতে চাচ্ছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলতেন, সে যখন বদর অভিমুখে যাত্রা করে এবং (কোনো) সাহায্যপ্রার্থী আসে, তখন উমাইয়্যার স্ত্রী তাকে বলে, তোমার কি সেকথা স্মরণ নেই যা তোমার মদিনাবাসী ভাই তোমাকে বলেছিল? তার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আবু জাহল তাকে বলে, তুমি এই উপত্যকার সর্দারদের একজন তাই এক-দুই দিনের জন্য হলেও (আমাদের) সাথে চলো। অতঃপর সে তাদের সাথে দু'দিনের জন্য চলে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিধন করেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৩২) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩৯৫০)

কোনো কোনো জীবনীকার এ কথাও উত্থাপন করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছিলেন,তাকে তিনি হত্যা করবেন; অথচ তিনি (সা.) তাকে হত্যা করেননি। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন, এর অর্থ হলো তিনি (সা.) তার হত্যার কারণ হবেন। মহানবী (সা.) তো উমাইয়্যা বিন খালফ-এর ভাই, উবাই বিন খালফ ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করেননি। তাকে তিনি (সা.) উহুদের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। ব্যাখ্যাকারীগণ আরো বলেন, হযরত সা'দ (রা.) উমাইয়্যাকে হয়ত কেবল কথাই বলে থাকবেন যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথীরাতোমাকে হত্যা করবে। কেননা যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে আর রেওয়ায়েতে এটিও আছে যে, তিনি কিংবা তাঁর (সা.) সাথীরা তাকে হত্যা করবেন।

(গাযওয়াতুন নবী , সংকলক-আল্লামা আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবী, পৃ: ৭০)

যাইহোক, এ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এ বিতর্কের প্রয়োজন নেই যে, কে হত্যা করেছে। এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা পূর্ণতা লাভ করেছে।

অনুরূপভাবে আবু লাহাবও যুদ্ধে যেতে ভীতত্রস্ত ছিল। সে নিজের স্থলে অন্য একজনকে পাঠিয়েছিল, নিজে যুদ্ধে যায়নি। আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্নই ছিল তার যুদ্ধে না যাওয়ার (মূল) কারণ। সে বলতো, আতেকার স্বপ্ন হাত থেকে কোনো বস্ত গ্রহণ করার মতো বিষয় অর্থাৎ সুনিশ্চিত কথা।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে লিখেছেন, "কেবল দু'জন ব্যক্তি ছিল যারা এ অভিযানে অংশগ্রহণ করতে ইতস্তত করেছিল। আর তারা ছিল আবু লাহাব ও উমাইয়্যা বিন খালফ। তাদের এই ইতস্ততা মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতার কারণে ছিল না। বরং আবু লাহাব তার বোন আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্নকে ভয় পাচ্ছিলো, যা সে যমযম-এর (মক্কায়) আগমনের মাত্র তিন দিন পূর্বে কুরাইশের নিপাত হওয়া সম্পর্কে দেখেছিল। আর উমাইয়্যা বিন খালফ তার মৃত্যু সংক্রান্ত মহানবী (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে ভীতত্রস্ত ছিল আর হযরত সা'দ বিন মুআযের মাধ্যমে সে (মক্কায়) এ সংবাদ পেয়েছিলো। কিন্তু যেহেতু এই দু'জন প্রসিদ্ধ নেতা পিছিয়ে থাকলে সাধারণ কাফেরদের ওপর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ছিল, এ কারণে অন্যান্য কুরাইশ নেতা আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করে ও উদ্বু দ্ধ করে এ দু'জনকে (যুদ্ধে যেতে) সম্মত করায়। অর্থাৎ উমাইয়্যা নিজেই যেতে সম্মত হয়ে যায় আর আবু লাহাব যথেষ্ট অর্থ-কড়ি দিয়ে অন্য একজনকে নিজের স্থলে দাঁড় করিয়ে দেয়। এভাবে তিন দিনের প্রস্ত তির পর এক সহস্রাধিক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বাহিনী মক্কা থেকে যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এই সৈন্যদলের মক্কায় থাকতেই কতিপয় কুরাইশ নেতার মনে পড়ে, যেহেতু বনু কিনানা গোত্রের শাখা বনু বকরের সাথে মক্কাবাসীদের সম্পর্ক ভালো নয় তাই কোথাও এমন না হয় যে, তাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা তাদের অবর্তমানে মক্কায় আক্রমণ করে বসবে। আর এই ধারণার ব শবর্তী হয়ে কিছু কুরাইশ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বনু কেনানার একজন সরদার সুরাকা বিন মালেক বিন জোশাম তাদেরকে আশ্বস্ত করে, যে তখন মক্কাতে অবস্থান করছিল। সে বলে, আমি এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, মক্কার ওপর কোনো আক্রমণ হবে না, বরং সুরাকা মুসলমানদের বিরোধিতায় এতটা উন্মাদ ছিল যে, কুরাইশদের সাহাযার্থে সে নিজেও বদর পর্যন্ত যায়। কিন্তু সেখানে মুসলমানদেরকে দেখে তার ওপর এমন ভীতি বিরাজ করে যে, যুদ্ধের পূর্বেই সে নিজ সঙ্গীসাথিদের ছেড়ে পালিয়ে আসে। .....

মক্কা থেকে যাত্রার পূর্বে কুরাইশরা কাবা শরীফে গিয়ে দোয়া করে যে, হে খোদা! আমাদের উভয় দলের মাঝে যে দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তোমার দৃষ্টিতে অধিক ভালো ও অধিক উত্তম তুমি তার সাহায্য করো আর অপর দলকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করো।"

এরপর কাফের সেনা বড় আড়ম্বর ও গর্বের সাথে মক্কা থেকে যাত্রা আরম্ভ করে।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব, পৃ: ৩৫০-৩৫১)

(এভাবে) নিজ ধ্বংসের দোয়া তারা নিজেরাই করে নেয়। এই তথ্যও রয়েছে যে, শুরুতে মক্কার সৈন্য সংখ্যা তেরশ' ছিল। (আর রাহিকুল মাখতুম, পৃ: ২৮১)

কিন্তু বনু যোহরা ও বনু আদীর সদস্যরা পথিমধ্যে এই সেনাদল থেকে পৃথক হয়ে যায়। এভাবে কুরাইশ সৈন্যদলের সংখ্যা সাড়ে নয়শ অথবা আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী এক হাজার অবশিষ্ট থাকে। তাদের কাছে একশ বা কতকের মতে দুইশ ঘোড়া, সাতশ উট, ছয়শ বর্ম এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র যেমন বর্শা, তরবারি, তির-ধনুক প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত, লি ইবনে কাসীর, পৃ: ২৪৮-২৪৯) (সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব, পৃ: ৩৫২)

কুরাইশ সরদারদের মৃত্যু সম্পর্কে জুহায়েম বিন সালত-এর একটি স্বপ্নে র উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরাইশ সদস্যরা মক্কা থেকে বের হয়ে জোহফা'তে অবতরণ করে। জোহফা মক্কা হতে মদিনার দিকে প্রায় ৮২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। জুহায়েম বিন সালত লোকের কাছে বর্ণনা করে যে, আমি স্বপ্ন দেখেছি, এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চেপে আসে এবং তার কাছে একটি উটও আছে। আর সেই ব্যক্তি বলছে যে, উতবা বিন রাবিআ নিহত হয়েছে, শায়বা বিন রাবিআ নিহত হয়েছে, আবুল হাকাম বিন হিশাম অর্থাৎ আবু জাহল নিহত হয়েছে, উমাইয়্যা বিন খালফ নিহত হয়েছে এবং অমুক অমুক অর্থাৎ কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যারা পরবর্তীতে বদরে নিহত হয়েছে তাদের সবার নাম নেয়। এরপর আগন্ত ক সেই ব্যক্তি নিজ উটের ঘাড়ে বর্শা ছুড়ে আঘাত করে আমাদের সেনাদলের দিকে ছুড়ে মারে। এর ফলে আমাদের সেনাদলের এমন কোনো তাবু বাকি রইল না যাতে সেই উটের রক্ত লাগেনি। আবু জাহল এই স্বপ্ন শুনে বিদ্রুপমেশানো ক্রোধের সাথে বলে, বনু মুত্তালিবে আরও একজন নবীর জন্ম হয়েছে! আগামীকাল আমরা যদি যুদ্ধ করি তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কে নিহত হয়।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত, লি ইবনে কাসীর, পৃ: ৪২২-৪২৩)

যাহোক যেমনটি বলা হয়েছে, আবু সুফিয়ান পথ পরিবর্তন করে চলে গিয়েছিল। সে আবু জাহলকে বার্তা পাঠায়, যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, ফিরে এসো। আর গতবারও যেমনটি বর্ণিত হয়েছিল যে, আবু সুফিয়ান স্বয়ং সাবধানতা অবলম্বন করত কাফেলা থেকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ঝরনার কাছে আসে আর সেখানে কোনো এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেসা করে যে, তুমি কি কাউকে আসা-যাওয়া করতে দেখেছো? সে উত্তর দেয়, আমি সন্দেহভাজন কোনো ব্যক্তিকে তো দেখিনি তবে দুইজন যাত্রীকে দেখেছি যারা তাদের উট ঐ টিলার কাছে বসিয়েছিল আর মশকে পানি ভর্তি করে চলে যায়। আবু সুফিয়ান তাদের উট বসানোর স্থানে আসে এবং তাদের উটের গোবর উঠিয়ে ভাঙলে তাতে খেজুরের আঁটি পায়। এটি দেখে সে বলে উঠে, খোদার কসম এটি মদিনার পশুখাদ্য। সে দ্রুত নিজ সাথীদের কাছে ফিরে আসে এবং তাদের উটগুলোর মুখে আঘাত করে সেগুলোর যাত্রাপথ পরিবর্তন করে নেয় এবং সমুদ্রউপকূল অভিমুখে বেরিয়ে যায় আর বদরকে তার ডান পার্শ্বে রেখে দ্রুততার সাথে চম্পট দেয়।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত, লি ইবনে কাসীর, পৃ: ৪২২)

এটি গত খুতবায়ও আমি বর্ণনা করেছি। যাহোক তার কাফেলার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর আবু সুফিয়ান কুরাইশদের এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করে যে, তোমরা কেবল নিজ কাফেলা, লোকজন এবং সম্পদ বাঁচাতে বেরিয়েছিলে, আল্লাহ্ তা'লা তা রক্ষা করেছেন, তাই তোমরা ফিরে আসো। কিন্তু আবু সুফিয়ানের এই বার্তা শুনে আবু জাহল বলে, খোদার কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বদরে না পৌঁছাবো ততক্ষণ আমরা কোনো ক্রমেই ফিরে যাবো না।

আরবের মেলার স্থানসমূহের মাঝে অন্যতম একটি ছিল বদর, যেখানে প্রতিবছর তাদের বাজার বসত।

সে বলল, আমরা সেখানে তিন দিন অবস্থান করব, উট জবাই করব, খাওয়াদাওয়া করাব, মদ পান করাবো। আমাদের দাসীরা আমাদের সামনে সংগীত পরিবেশন করবে। সমগ্র আরব আমাদের সম্পর্কে, আমাদের অভিযান ও আমাদের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে শুনবে আর তারা সবসময় আমাদের ভয়ে ভীত থাকবে। তাই এগিয়ে চলো।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২৩)

ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে সে (অর্থাৎ আবু জাহল) বলল, যেকোনো মূল্যে সেখানে আমাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে যেতেই হবে। তার সাথে বনু যোহরা গোত্রও ছিল। এ সম্পর্কে লেখা আছেযে, তারাও ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আবু সুফিয়ানের সংবাদ শোনার পর বনু যোহরা গোত্রের মিত্র আখনাস বিন শরীক বলে, হে বনু যোহরা! আল্লাহ্ তোমাদের সম্পদও নিরাপদরেখেছেন এবং তোমাদের বন্ধু মাখযামা বিন নওফেলকেও মুক্তি দিয়েছেন। সে আবু সুফিয়ানের কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তোমরা মাখযামাকে বাঁচানো এবং নিজেদের সম্পদের হেফাজতের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছিল। কাপু রুষতার অপবাদ তোমরা আমার প্রতি আরোপ কোরো। মানুষ তো এটাই বলবে যে, তোমরা

কাপুরুষ তাই যুদ্ধ থেকে পালাচ্ছে। তাই সে বলে যে, অপবাদ আমার প্রতি আরোপ কোরো আর ফিরে চলো, কেননা ক্ষয়ক্ষতি না হলে তোমাদের বের হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আবু জাহলের কথায় কান দিও না। অতএব তারা ফিরে যায় এবং বনু যোহরা গোত্রের কেউ যুদ্ধে অংশ নেয়নি। একইভাবে বনু আদী বিন কা'ব থেকেও কোনো সদস্য যুদ্ধে অংশ নিতে যায়নি এবং সবাই ফেরত চলে যায়। কুরাইশদের সৈন্যবাহিনী সামনে অগ্রসর হতে থাকে।

হযরত আবু তালেবের পুত্র তালেব-ও এই সৈন্যবাহিনীতে ছিল।

কুরাইশের কিছু লোকের সাথে তার কথা হয়। কুরাইশরা তাকে খোটা দিয়ে বলে যে, হে বনি হাশেম! খোদার কসম, আমরা জানি, যদিও তোমরা আমাদের সাথে এসেছো কিন্তু তোমাদের আন্ত রিক সহানুভূতি মুহাম্মদ (সা.) এর সাথেই রয়েছে। একথা শুনে তালেব তার কয়েকজন বন্ধুর সাথে মক্কায় ফেরত চলে যায়। এক রেওয়ায়েতে এই কথাও উল্লেখিত দেখা যায় যে, তালেব বিন আবু তালেব বাধ্য হয়ে মুশরেকদের সাথে বদরে গিয়েছিল। কিন্তু বন্দিদের মাঝেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি আর নিহতদের মাঝেও না আর নিজের ঘরেও ফিরে আসেনি। (তারিখে তাবারী, পৃ: ১৩৭) এটি তাবারীর উদ্ধৃতি।

যাইহোক, অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী, যা তেরোশ থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় এক হাজার রয়ে গিয়েছিল, তারা নিজেদের যাত্রা অব্যাহত রাখে এবং বদরের কাছে একটি টিলার পিছনে গিয়ে নিজেদের তাঁবু খাটায়।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২৩)

মহানবী (সা.)-এর মদিনা থেকে যাত্রা এবং মুসলমান সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) দ্বিতীয় হিজরী সনের বারো রমজান রোজ শনিবার মদিনা থেকে যাত্রা করেন। তাঁর (সা.) সাথে তিনশ'র কিছু বেশি লোক ছিল যাদের মধ্যে চুয়াত্তর জন মুহাজের এবং অন্যরা ছিল আনসার। এটি প্র থম যু দ্ধ ছিল যেখানে আনসাররাও অংশ নিয়েছিল। হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-কে মহানবী (সা.) মদিনাতেই অবস্থান করার নির্দেশ দেন কেননা তার (রা.) সহধর্মিণী হযরত রুকাইয়্যা বিনতে রসূল (সা.) অসুস্থ ছিলেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উসমান নিজেই অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু বেশি প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত এটিই যে, তার মোহতরমা স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে মুসলমানদের সংখ্যা ৩১৩ বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত বারা' বিন আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর যেসব সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারা আমাকে বলেছেন, তাদের সংখ্যা ঠিক ততজন ছিলেন যতজন তালূতের সাথে তার সঙ্গী হিসেবে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল, অর্থাৎ ৩১০ থেকে কয়েকজন বেশি। হযরত বারা' বলতেন, খোদার কসম, তালূতের সাথে কেবল মু'মিনরাই সমুদ্র পার করেছিল। (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ:) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নম্বর-৩৯৫৭) (গাযওয়াতুন নবী, সংকলক- আল্লামা বুরহান হালবি, পৃ: ৭২)

একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) সাহাবা (রা.)-কে গণনার নির্দেশ দেন। গণনার পর মহানবী (সা.)-কে তারা সংবাদ দেন যে, (আমাদের লোকসংখ্যা) ৩১৩জন। (একথা শুনে) তিনি (সা.) খুবই আনন্দিত হন আর বলেন, তালূতের সঙ্গীদের সমান। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫)

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা দেখতে পাই, বদরের উদ্দেশ্যে বের হওয়া সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ৩১৩জন। তারা যদি ৩১৩-এর পরিবর্তে ৬০০ বা ৭০০ সংখ্যায় বের হতেন আর যেসব সাহাবী মদিনায় অবস্থান করছিলেন তারাও তাদের সাথে যোগ দিতেন তাহলে তাদের জন্য যুদ্ধ অনেক সহজ হয়ে যেত। এ যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ (সা.)-কে অবহিত করেছিলেন আর একই সাথে নিষেধ করে বলেন, যুদ্ধের কথা কাউকে না বলতে। আর এর কারণ ছিল, আল্লাহ্তা'লা অতীতের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করতে চেয়েছিলেন।

যেমন সাহাবীদের সংখ্যা ৩১৩জন ছিল এবং বাইবেলে এ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান ছিল যে, গিদিয়নের সাথে যা ঘটেছিল সেই একই ঘটনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের সাথেও ঘটবে। নবী গিদিয়ন যখন তাঁর শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তাঁর দলে লোকসংখ্যা ছিল ৩১৩জন। তাই যদি সাহাবীরা জেনে যেতেন যে, আমরা যুদ্ধের জন্য মদিনা থেকে বের হচ্ছি তাহলে তারা সবাই বের হয়ে আসতেন এবং তাদের সংখ্যা ৩১৩ হতে বেশি হয়ে যেতো। এ প্রজ্ঞার অধীনেই আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন যাতে সাহাবীদের (রা.) সংখ্যা ৩১৩ অতিক্রম না করে। কেননা ৩১৩জন সাহাবীর যাত্রা করাই ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করতে পারত, তাই যু দ্ধের সংবাদ গোপন রাখা আবশ্যক ছিল। কাজেই যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছানোর পর সাহাবীদের জানানো হয় যে, তোমাদের মোকাবিলা হবে কুরাইশ বাহিনীর সাথে। "

(এক আয়াত কি পুর মারেফ তফসীর, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৬১৯)

উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নওফেল নামে একজন মহিলা ছিলেন। জিহাদে যোগ দেওয়া সম্পর্কে তাঁর আবেগ ও উচ্ছ্বাস সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (সা.) যখন বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন তখন হযরত উম্মে ওয়ারাকা তাঁর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাকেও জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিন, আমি আপনার সাথে অসুস্থদের সেবাশুশ্রূষা করব। হতে পারে আল্লাহ্ আমাকেও শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য দান করবেন। উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, তু মি তোমার ঘরেই থাকো আর আল্লাহ্ তোমাকে শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য দান করবেন। সেই মহিলা সাহাবীর পবিত্র কু রআন পড়া ছিল আর মহানবী (সা.) তার বাড়িতে যাতায়াত করতেন এবং তিনি (সা.) তার নাম রেখেছিলেন, শহীদা। তাই সাধারণ মুসলমানরাও তাকে শহীদা নামে ডাকত। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত উম্মে ওয়ারাকা (রা.)-এর এক দাস ও দাসী তাকে চাদর দিয়ে চেপে ধরে অজ্ঞান করে ফেলে আর এভাবে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এই দাস ও দাসী সম্পর্কে তিনি (রা.) ওসীয়্যত করে রেখেছিলেন যে, আমার মৃ ত্যুর পর তারা মুক্ত হয়ে যাবে। হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে হত্যাকারীদের ফাঁসি দেওয়া হয়। হযরত উমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সত্য বলেছিলেন। তিনি (সা.) বলতেন, আমার সাথে চলো শহীদার সাথে সাক্ষাৎ করে আসি। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯৭)

তার ঘরে যাওয়ার সময় তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীকেও সাথে নিয়ে যেতেন।

একটি রেওয়ায়েতে মুসলিম সেনাবাহিনীর শক্তিসামর্থ্যের বিবরণ নিম্ন রূপ লেখা হয়েছে। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই যুদ্ধে মুসলমানদের পাঁচটি ঘোড়া ছিল। কারো কারো মতে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল, একটি হযরত মিকদাদ (রা.)-এর ঘোড়া এবং আরেকটি ছিল হযরত যুবায়ের (রা.)-এর। হযরত আলী (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, বদরের দিন হযরত মিকদাদ (রা.) ছাড়া আর কোনো অশ্বারোহী ছিলেন না। তাই রেওয়ায়েতে ঘোড়ার সর্বোচ্চ যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা হলো পাঁচ। মুসলমানদের কাছে ৭টি বর্ম ছিল এবং উটের সংখ্যা ছিল ৭০ বা ৮০ যাতে তারা সবাই পালাক্রমে আরোহন করতেন। মহানবী (সা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মারসাদ বিন আবু মারসাদ (রা.) একটি উটে পালাক্রমে আরোহণ করতেন। মহানবী (সা.)-এর পায়ে হাঁটার পালা এলে তাঁ র অন্য দুজন সাথি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার পালায় আমরা পায়ে হেঁটে যাব আপনি বাহনেই থাকুন। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও আর পুণ্য ও প্রতিদানের বিষয়ে আমি তোমাদের চেয়ে ভ্রুক্ষেপহীন নই।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৪-২০৫) (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৯) (গাযওয়াতুন নবী, সংকলক আল্লামা আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবি, পৃ: ৭৬) (দালায়েলুন নবুয়্যত লিল বাইহাকি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২)

অর্থাৎ আমিও এ যুদ্ধের এ অভিযানের সওয়াব পেতে চাই।

সাহাবীদের সপক্ষে মহানবী (সা.)-এর একটি দোয়া ছিল, সে সম্পর্কে লেখা আছে যে, পথিমধ্যে একটি স্থান অতিক্রম করার সময় মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদের জন্য দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! এরা খালি পায়ে আছে, এদেরকে তুমি বাহন দান করো। এরা বিবস্ত্র, এদেরকে তুমি পোশাক দান করো। এরা ক্ষুধার্ত,এদেরকে তুমি পরিতৃপ্ত করো। এরা রিক্তহস্ত, এদেরকে তুমি স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী করো। অতএব এ দোয়া গৃহীত হয় আর বদরের যুদ্ধ থেকে ফেরত আসা লোকদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে বাহনে যেতে চেয়েছে আর ব্যবহার করার জন্য সে একটি বা দুটি উট পায়নি। একইভাবে যাদের কাছে কাপড় ছিল না তারা কাপড় পেয়ে যায় আর তারা এতটা রশদ লাভ করে যে, পানাহার দ্রব্যের কোনো ঘাটতি ছিল না। অনুরূপভাবে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণস্বরূপ এত বেশি পরিমাণ বিনিময় আসে যে, প্রতিটি পরিবার সম্পদশালী হয়ে যায়।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৪) (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৯) (গাযওয়াতুন নবী, সংকলক আল্লামা আলি বিন বুরহানুদ্দীন হালবি, পৃ: ৭৬) (দালায়েলুন নবুয়্যত লিল বাইহাকি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২)

কিছু মানুষ মদিনায় অবস্থান করে এবং কিছু সংখ্যক অল্প বয়স্ক যোদ্ধাকে মহানবী (সা.) ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এ সম্পর্কে লেখা আছে, বদরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ঘোষণা যদিও গণ ঘোষণা ছিল কিন্তু এর জন্য খুব বেশি প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। যেমন, রেওয়ায়েত রয়েছে– কিছু মানুষ নিবেদন করে যে, মদিনা থেকে কিছুটা দূরে আমাদের বাহন রাখা আছে, আমরা সেগুলো নিয়ে আসি। (কিন্তু তাদেরকে) বলা হয়, না (আনা যাবে না)। ফলে এসব লোককে (মদিনাতেই) থাকতে দেওয়া হয় অথবা তারা কোনো বাহন ছাড়াই যাত্রা করে। এখানে যেটি লেখা রয়েছে তা হলো, এটি সাধারণ ঘোষণা ছিল। এটি সর্বজনীন (নির্দেশ) ছিল ঠিকই কিন্তু তথাপি বিধিনিষেধ ছিল। আর মহানবী (সা.) কাউকে প্রস্তুতির খুব একটা সুযোগও দেননি যাতে বেশি লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিতে না পারে। যাহোক, লেখা আছে যে, এভাবে কিছু নিষ্ঠাবান মানুষ এমন ছিলেন যারা কোনো না কোনো কারণে পেছনে রয়ে যাওয়ার অনুমতি পান। যেমন, হযরত উসমান (রা.)-এর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে আবু উমামা বিন সা'লবা (রা.)-এর মা অসুস্থ ছিলেন তবুও তিনি যুদ্ধের বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হন, কিন্তু মহানবী (সা.) নির্দেশ দেন, তিনি যেন তার অসুস্থ মায়ের কাছে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) বদর থেকে ফিরে আসার পূর্বে ই তাঁর মা ইন্তেকাল করেন। মহানবী (সা.) তার কবরে গিয়ে দোয়া করেন। হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.), যিনি অত্যন্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সাথে লোকদেরকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। তাকে সাপে দংশন করে, ফলে তিনি মদিনায় রয়ে যান। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) পথিমধ্যে একটি স্থানে যাত্রা বিরতি দিয়ে অল্প বয়স্ক যোদ্ধাদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাদের মধ্যে একজন উমায়ের বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)ও ছিলেন। কিশোরদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ শুনার পর তিনি কান্না আরম্ভ করেন। ফলে মহানবী (সা.) তাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেন। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন

এবং শাহাদত বরণ করেন। যেসব অল্প বয়স্ক যোদ্ধাকেফেরত পাঠানো হয়েছিল তাদের মাঝে উসামা বিন যায়েদ, রাফে বিন খাদিজ, বারা ' বিন আযেব, হুসায়েদ বিন যুহায়ের, যায়েদ বিন আরকাম এবং যায়েদ বিন সাবেত (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৪-২০৫) (আল বাদাইয়াতও ওয়ান নিহাইয়াতু, ৫মখণ্ড, পৃ: ২২৭) (দালায়েলুন নবুয়্যত লিল বাইহাকি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বর্তমানে এমন যুগ এসেছে যখন মানুষ ইসলাম এবং ঈমানের খাতিরে কুরবানী করাথেকে বাঁচার জন্য অজুহাত খুঁজে বেড়ায় আর সময় এলে বলে, আমাদের এই সমস্যা ও সেই প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাবে মুসলমানদের মাঝে কুরবানীর এমন স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে পুরুষ এবং সাবালিকা মহিলাদের কথা তো বাদই দিলাম, কিশোররাও এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিল, এমনকি বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) সাহাবীদের ডাকেন যাতে তাদের মাঝ থেকে তাদেরকে তিনি (সা.) নির্বাচন করতে পারেন যারা যুদ্ধ করার যোগ্য। তখন এক কিশোর ছেলে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে (তিনি নিজেও এবং অন্য সাহাবীরাও বর্ণনা করেন যে,) যখন সাহাবীরা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান তখন সেও ইসলামের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার সুযোগ লাভ করার কথা ভেবে লাইনে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু অন্যদের তুলনায় তার উচ্চতা কম হওয়ার দরুন অন্যদের চেয়ে ছোট মনে হতো। তার ভয় হচ্ছিল, সে না আবার বাদ পড়ে যায়, তাই সে পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে গোড়ালি উঁচু করে দাঁড়ায় যাতে বড় দেখায়। একই সাথে নিজের বুক টান করে দাঁড়ায় যাতে দুর্বল মনে না হয়। মহানবী (সা.) বলেন, ১৫ বছরের কম বয়সী কোনো ছেলেকে যেন না নেওয়া হয়। বাছাই করতে করতে তিনি (সা.) যখন সেই ছেলের কাছে পৌঁছান তখন তাকে দেখে বলেন, এ তো বাচ্চা ছেলে একে কে দাঁড় করিয়েছে? একে সরিয়ে দাও। (এই ঘটনা যদি বর্তমান যুগে ঘটতো তাহলে হয়তো এমন ছেলে এই ভেবে আনন্দে লাফাতো যে 'আমি বেঁচে গেছি'।) কিন্তু সেই ছেলেকে যখন লাইন থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল তখন সে এতো কাঁদে এতো কাঁদে যে, তার কান্না দেখে মহানবী (সা.)-এর দয়া হয় আর তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে তাকে নিয়ে নেওয়া হোক।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড- ১৭, পৃ: ২৬৫)

এই সফরের সময় মহানবী (সা.) যাকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন সে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মদীনা থেকে যাত্রা করার সময় তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু যখন তিনি (সা.) রওহা নামক স্থানের কাছাকাছি পৌঁছান যা মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত তখন সম্ভবত এই চিন্তা করে যে, আব্দুল্লাহ্ একজন অন্ধ মানুষ আর কুরাইশ বাহিনীর একান্ত কাছে এসে যাওয়া সংক্রান্ত সংবাদের দাবি হলো, মহানবী (সা.)-এর অবর্তমানে মদীনায় ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় থাকা। তাই তিনি (সা.) আবু লুবাবা বিন মুনযের (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে মদীনায় ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম সম্পর্কে নির্দে শ দেন, তিনি কেবল ইমামুস্ সালাত থাকবেন কিন্তু প্রসাশনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন আবু লুবাবা (রা.)। মদীনার উঁচু অংশ অর্থাৎ কুবার জন্য তিনি (সা.) হযরত আসেম বিন আদী (রা.)-কে পৃথক আমীর নিযুক্ত করেন। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ পৃ: ৩৫৪)

ইসলামী সেনাবাহীনির পতাকা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাবাহিনীর পতাকা বহনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে। এটি ছিল সাদা রংয়ের পতাকা। এটি ছাড়াও দু'টি কালো রংয়ের পতাকা ছিল যার একটি ছিল হযরত আলী (রা.)'র নিকটে যার নাম ছিল উকাব আর সেটি হযরত আয়েশা (রা.)'র ওড়না দিয়ে প্রস্তত করা হয়েছিল। অন্য পতাকাটি ছিল একজন আনসারী সাহাবীর কাছে।

এক বর্ণনা অনুযায়ী মুসলিম সেনাবাহিনীর নিকট তিনটি পতাকা ছিল।

মুহাজিরদের পতাকা ছিল হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র নিকট, খাযরাজ গোত্রের পতাকা ছিল হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.)'র নিকট এবং অওস গোত্রের পতাকা ছিল হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র নিকট।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৩)

হযরত খওয়াত বিন জুবায়েরও যুদ্ধের এই সফরে সাথে ছিলেন কিন্তু পথে একস্থানে তার পায়ে একটি পাথরের আঘাত লাগার কারণে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত শুরু হয়। সেকারণে তার হাঁটার সামর্থ্য ছিল না তাই তিনি মদীনায় ফেরত যান। মহানবী (সা.) তার জন্যও গনিমতের মালে একটি অংশ রেখেছিলেন। কোনো কোনো আলেমের মতে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০২)

কিন্তু সঠিক রেওয়ায়েত হলো, তিনি ফেরত চলে এসেছিলেন।

মুশরিকদের সাহায্য নিতে অস্বীকার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মদীনায় হুবায়েব বিন ইয়াসাফ নামের একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী ব্যক্তি ছিল, সে খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিল। সে বদরের যুদ্ধের পূর্ব পর্য ন্ত মুসলমান হয় নি কিন্তু সেও তার জাতি খাযরাজ গোত্রের সাথে যুদ্ধের জন্য বের হয় আর যুদ্ধ জয়ের পর তার গনিমতের সম্পদ লাভেরও আশা ছিল। তাকে সাথে পেয়ে মুসলমানরাও অনেক আনন্দিত হয়েছিল, কেননা সেও তাদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে বলেন, আমাদের সাথে সে-ই যুদ্ধে যেতে পারবে যে আমাদের ধর্মের অনুসারী। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে- তিনি বলেছেন, তুমি ফিরে যাও; আমরা মুশরিকদের সাহায্য নিতে চাই না। হাবীব বিন ইয়াসাফ দ্বিতীয়বার পুনরায় মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে কিন্তু মহানবী (সা.) দ্বিতীবারও তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। অবশেষে তৃতীয়বার সে যখন আসে তখন তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনছ। সে বলে, হ্যাঁ; একথা বলে সে মুসলমান হয়ে যায় আর অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৪-২০৪)

এই সফরে হযরত সা'দের হরিণ শিকার করারও উল্লেখ পাওয়া যায়। পথিমধ্যে এক জায়গায় পৌঁছে মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে বলেন, হে সা'দ! হরিণকে দেখো আর তির নিক্ষেপ করো। তিনি রাস্তায় হরিণ দেখতে পান, মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে আপন পবিত্র চিবুক হযরত সা'দের উভয় বাহু এবং কানের মাঝে রাখেন এবং বলেন, তির নিক্ষেপ করো; (আর দোয়া করেন) হে আল্লাহ্ ! সাদের লক্ষ্য নির্ভুল করে দাও। এরপর তিনি তির নিক্ষেপ করেন, তার তীর হরিণ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। তখন মহানবী (সা.) মুচকি হাসেন আর হযরত সা'দ (রা.) দৌড়ে গিয়ে সেই হরিণকে ধরেন। তিনি দেখেন, এখনো এর মাঝে প্রাণের স্পন্দন অবশিষ্ট আছে। অতঃপর তিনি এটিকে জবাই করে তুলে নিয়ে আসেন। এরপর মহানবী (সা.)-এর নির্দে শক্রমে সাহাবীদের মাঝে এটি বণ্টন করে দেওয়া হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫)

মহানবী (সা.) যাত্রা অব্যাহত রাখেন; যখন সাফরা নামক স্থানে পৌঁছেন যা সবুজ শ্যামল এবং খেজুর গাছে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা ছিল। এটি বদর প্রান্তর থেকে এক মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত। যাহোক, মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে দু'জনকে বদর অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং নিজেও সৈন্য সামন্ত নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। এভাবে জাফরান নামক উপত্যকা অতিক্রম করে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করেন। এটি সাফরা উপত্যকার পার্শ্ববর্তী একটি উপত্যকা।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২০) (আল মুজামুল বালদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৮)

যে দু'জনকে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য মহানবী (সা.) পাঠিয়েছিলেন তারা যেতে যেতে একেবারে বদরের প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে ঝর্ণার নিকটে এক টিলার পাশে উট বসিয়ে রেখে পানির মশক নিয়ে তাতে পানি ভরতে থাকেন। তারা সেখানে দু'জন নারীর কণ্ঠ শুনতে পান, যারা একে অপরের হাত ধরে পানি নিতে আসছিল। তাদের একজন অপরজনকে বলছিল, কাল বা পরশু কাফেলা আসবে আমি তাদের কাজ করে পারিশ্র মিক পেলে তোমার ঋণ শোধ করে দিব। এই মেয়েরা ছাড়া আরো একজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, সেই ব্যক্তি বলে, তুমি সত্য বলছ। মহানবী (সা.) প্রেরিত লোকেরা একথা শুনে ফেলে আর উভয়ে তাদের উটে চড়ে ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে যা শুনেছিল তা অবগত করেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২২)

তারা বলে, এক সৈন্যবাহিনী আসছে। মহানবী (সা.)-এর কাছে যখন এ বার্তা এসে পৌঁছে তখন তিনি (সা.) আরো সতর্ক হয়ে যান। অবশিষ্ট বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে তুলে ধরা হবে।

এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই। এদের মধ্যে একটি হলো হাযের জানাযা। এটি যুক্তরাজ্য নিবাসী মুকাররম শেখ গোলাম রহমানী সাহেবের। সম্প্রতি ৯২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। তিনি অমৃতসর নিবাসী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেখ গোলাম জিলানী সাহেবের পুত্র এবং মুকাররম শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের জামাতা ছিলেন। শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব দীর্ঘদিন করাচী জামাতে কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন, অনেকদিন করাচী জামাতের আমীরও ছিলেন। শেখ গোলাম রহমানী সাহেবের পিতা ১৯০২ সালে কাদিয়ান সফর করেছিলেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দর্শন লাভ করেন এবং এ চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না- একথা বলে তৎক্ষণাৎ বয়আত করে নেন। গোলাম রহমানী সাহেব ১৯৫৮ সালে যুক্তরাজ্যে এসে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (তড়িৎ প্রকৌশলী) বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি এখানে দীর্ঘকাল যাবৎ হাসপাতালে মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলে কাজ করেন। বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী এবং ১০ বছরেরও অধিক কাল সাউথ হল জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবাদানের তৌফিক লাভ করেন। স্থানীয় কাউন্সিল থেকে সাউথ হল মিশনের মঞ্জুরীর জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা করেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করেছেন। একটি বাড়িতে মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠা করা হলে একজন প্র তিবেশী স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করে। প্রশাসন পরিস্থিতি পর্য বেক্ষণ করে তা বন্ধ করে দিতে চায় কিন্তু রহমানী সাহেব অনেক চেষ্টা করে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর অবস্থান প্রশাসনের নিকট উপস্থাপন করেন যার ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সফলতা লাভ হয় এবং জামাতের স্বপক্ষে রায় আসে। রহমানী সাহেব বছরের পর বছর সাউথ হল মিশন হাউজে রবিবারের ক্লাসের আয়োজন করেছেন এবং নতুন প্রজন্মের অনেককেই তার মাধ্যমে ইসলাম

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

আহমদীয়াতের শিক্ষায় আলোকিত করেছেন। ১৯৯৬ সালে তিনি ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসায়া হিসেবে নিযুক্ত হন আর ২০০৫ সালে আমি যখন ওসীয়্যত সম্পর্কে তাহরীক করেছিলাম যে, চাঁদা প্রদানকারীদের শতকরা ৫০ ভাগ সদস্য মূসী হওয়া চাই, তখন তিনি নিরলস চেষ্টা করেন আর (মানুষকে) উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি ওসীয়্যত বিভাগকে কম্পিউটারাইজড্ও করেন এবং নিয়মতান্ত্রিক করেন।

মরহুম নামায -রোযা ও কুরআন পাঠে নিয়মিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সদালাপি, স্থিতধী, মিতভাষী, সৌহার্দ্য বজায় রেখে সাক্ষাৎ করতেন, একজন পুণ্যবান সহানুভূতিশীল ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। খিলাফতের প্রতি প্রাণঢালা ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তিনি হজ্জব্রত পালনেরও সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম মূসী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী জামিলা রহমানী ছাড়া এক পুত্র খালেদ রহমানী এবং এক কন্যা আয়েশাকে রেখে যান। তিনি আল্ ইসলাম ওয়েবসাইটের চেয়ারম্যান ডাক্তার নাসীম রহমতুল্লাহ্ সাহেবের ভগ্নিপতী ছিলেন।

মুরুব্বী সিলসিলাহ্ লায়েক তাহের সাহেব লিখেন, (মরহুম) প্র তি মাসে মসজিদে ফযলে আসতেন এবং বড় অঙ্কের চাঁদা প্রদান করে রশীদ নিয়ে যেতেন। সেযুগে তাঁর সাথে আমার এতটুকুই জানাশোনা ছিল কিন্তু তাঁর পুণ্যের একটি গভীর প্রভাব ছিল আমার হৃদয়ে। বিস্তারিত পরিচয় ১৯৯০ সালে হয়েছিল যখন এখানে মুরুব্বী হিসেবে তার সাউথ হলে পদায়ন হয়। তিনি বলেন, তিনি ছিলেন সাউথ হলের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট। নিজের বাড়ির মতো মিশন হাউজের দেখাশোনা করতেন। অধিকাংশ সময় মিশন হাউজে অবস্থান করতেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন। মিশন হাউজ সম্প্রসারণের কাজও তাঁর যুগেই হয়েছে। তিনি ছিলেন নিপাট ভদ্র লোক, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবার সাথে স্নেহ, ভালোবাসা ও প্রবীণসুলভ হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন। জামাতের অর্থ সুরক্ষা করতেন এবং অত্যন্ত নিঃস্বার্থ বৈশিষ্ট্যের মানুষ ছিলেন। সত্যিই তার মাঝে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলী ছিল এছাড়া তার মাঝে আমিও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন এবং খিলাফতের সাথে তাঁর পরম বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। এক্ষেত্রে তিনি অনেক অগ্রগামী ছিলেন। এমন মানুষ দুর্লভ। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন আর তার সন্তান-সন্ততিকেও তার সৎকর্ম বজায় রাখার এবং তা ধারণ করার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয়টি গায়েবানা জানাযা। পূর্ববর্তী জানাযাটি ছিল হাযের; জুমু'আর নামাযের পর রহমানী সাহেবের জানাযা আদায় করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। প্রথম গায়েবানা জানাযাটি হলো– বুর্কিনা ফাসোর ডোরির মেহেদীয়াবাদ নিবাসী তাহের আগ মুহাম্মদ সাহেবের। সম্প্রতি ৪৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*** মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, তাঁর পিতা ১৯৯৯ সালে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন কিন্তু তিনি বয়আত করেন নি। ১৯ বছর বয়সে পায়ের কষ্টের চিকিৎসার্থে ওয়াগাডুগু যান। অসুস্থ অবস্থায় অনেক দোয়া করেন– আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সহজ-সরল পথ প্র দর্শন করো। আহমদীয়াত যদি সত্য হয় তাহলে আমাকে পথ প্রদর্শন করো। যৌবনেই তার ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়াও করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিভিন্ন স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি (আহমদীয়াতের সত্যতার বিষয়ে) নিশ্চিত হন এবং ফিরে এসে বয়আত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি জামা'তের সেলাই সেন্টারে দর্জির কাজ শেখেন আর এটিকেই তিনি নিজের জীবন জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বানিয়ে নেন। এবারের ঈদুল ফিতরে যারা বুর্কিনা ফাসোর শহীদ ছিলেন তাদের পরিবারের সদস্যদের কাপড় সেলাই করার ছিল। অন্য কোনো দর্জি তাদের কাজ নেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সেখানকার মুরব্বী রানা ফারুক সাহেব তার কাছে গিয়ে এ কাজ করবেন কিনা জানতে চান। তখন তিনি সম্মত হয়ে যান। স্বামী-স্ত্রী দিন-রাত কাজ করে ঈদের পূর্বে ই সত্তর জনের কাপড় সেলাই করে পাঠিয়ে দেন। মুহাম্মদ সাহেব তবলীগের গভীর আগ্রহ রাখতেন। খুবই শালীনভাবে কথা বলতেন। যদিও তিনি স্বল্পশিক্ষিত ছিলেন অথবা বলা চলে নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু খুব ভালো ফ্রে ঞ্চ বলতে পারতেন।

ক্যান্সারের কারণে তার পা হাঁটুর ওপর থেকে কেটে ফেলা হয়েছিল। কিছুদিন পূর্বে পুনরায় ঠিক সেখানেই রোগের আক্রমন হয় এবং ফুলে যায় যেখান থেকে পা কেটে ফেলা হয়েছিল। দেশের পরিস্থিতি যেহেতু প্রতিকূল, পথ-ঘাট সব বন্ধ তাই ওয়াগাডুগুর বড় হাসপাতালে যেতে পারেন নি, যেকারণে স্থানীয় হাসপাতালে থেকে যান। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আহমদীয়াত গ্রহণের পর থেকেই তিনি তবলীগের গভীর আগ্রহ রাখতেন। সবসময় (তবলীগের) কোনো না কোন পথ খুঁজে বের করতেন। তিনি স্মার্ট ফোন কিনেছিলেন এবং নিজেদের ইমাম আলহাজ ইব্রাহীম বারদ্গা সাহেবকে বলেন, এতে তবলিগী (আলোচনা) রেকর্ড করে মানুষের কাছে পয়গাম পাঠান আর এভাবেই তিনি তবলীগ করতেন এবং এতে যা ব্যয় হতো তা নিজেই বহন করতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি দু'জন স্ত্রী এবং পাঁচজন ছেলে-মেয়ে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দিন এবং মরহুমের পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দিন আর মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

অপর জানাযা খাজা দাউদ আহমদ সাহেবের। তিনি ২৫ মে, ২০২৩ তারিখে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। তার এক সন্তান খাজা ফাহাদ আহমদ সাহেব কিরিবাসে মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে (দায়িত্বরত) আছেন। তিনি বলেন, আমাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় আমার দাদা খাজা আব্দুল লাতিফ সাহেবের মাধ্যমে যিনি খাজা আহমদ দ্বীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। দাদাজান লালিত-পালিত হন তার নানা খাজা গোলাম মোহাম্মদ সাহেবের গৃহে, যিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার দাদাজান তার গৃহে লালিত-পালিত হওয়া অবস্থায় ১৯১৭ সালে সম্ভবত এগারো বছর বয়সে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তভুক্ত হন আর নিজের সকল ভাইবোনের মাঝে তিনি একাই আহমদী ছিলেন। কানাডায় তার দীর্ঘদিন জামা'তের কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। প্র থমে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে তাঁর দীর্ঘদিন কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৭৪ সালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ইসলামাবাদ-এর কায়েদ হিসেবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র পাকিস্তান জাতীয় সংসদে আগমনে তিনি দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাঁর এই সেবার বিষয়ে সন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছিলেন। পেশাগতভাবে তিনি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা এবং সুসম্পর্ক রাখতেন। উত্তমরূপে জামা'তের কাজ করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকতেন। মৃত্যুর সময় স্থ ানীয় সেন্টারেই ছিলেন, জামা'তের মজলিসে আমেলার মিটিং-এ ছিলেন। বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রার কিছু পূর্বে বুকে কিছুটা ব্যাথা অনুভব করেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিজ প্রভুর সকাশে গিয়ে উপস্থিত হন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে সহধর্মিনী ছাড়াও তার চার পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, তাঁর এক পুত্র ওয়াক্ফে যিন্দেগী অর্থাৎ মুরব্বী সিলসিলাহ্, কিরিবাসের মুবাল্লিগ আর সেখানে জলসার ব্যস্ততা এবং জামা'তী কাজের ব্যস্ততার জন্য কানাডায় আসতে পারেন নি, নিজের পিতার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেও ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন, মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মুকার্রম সৈয়দ তানভীর শাহ্ সাহেবের। তিনিও কানাডার স্যাসকাটুনের (ঝধংশধঃড়ড়হ) অধিবাসী। তিনি সম্প্রতি প্যারাগুয়েতে মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে তিনি ওয়াক্ফে আরযীর উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*** তারও একমাত্র পুত্র সৈয়্যদ রেযা শাহ্ জামাতের মুরব্বী । তানভীর শাহ্ সাহেবের মাতা ফররুখ খানম সাহেবা তুর্কিস্তান থেকে তার ভাই হাজী জুনুদুল্লাহ্ ও তার মায়ের সাথে কাদিয়ানে বয়আতের জন্য এসেছিলেন। তার ছেলে লিখেছেন, আমার দাদা সৈয়্যদ বশীর শাহ্ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত সৈয়্যদ আব্দুস্ সাত্তার শাহ্ সাহেব (রা.)'র দৌহিত্র ছিলেন। এভাবে হযরত উম্মে তাহেরের সাথেও তার আত্মীয়তা ছিল। মরহুম জামা'তের খুবই বিশ্বস্ত সদস্য ছিলেন। তানভীর শাহ্ সাহেব সর্বদা জামা'তের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তার ছেলে লিখেন, জামা'তের অনুষ্ঠানাদীতে অবশ্যই আমাদের নিয়ে যেতেন। প্রত্যেক শুক্রবার রীতিমত স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে (আমাদেরকে) জুমুআয় নিয়ে যেতেন। আর্থিক কুরবানীকে অনেক গুরুত্ব দিতেন। সবসময় বেতনের একটা অংশ সেজন্য পৃথক করে রাখতেন। পরিবারের লোকদের এবং জামা'তের লোকদেরও সর্বদা এরূপ করতে বলতেন। তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল। প্রায়শ জামা'তের উত্তম তবলীগ করার পন্থা সম্পর্কে বলতেন? প্যারাগুয়েতে তার উপস্থিতিতে দু'টি বয়আত হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত স্বল্পেতুষ্ট ছিলেন। কখনো ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করতেন না এবং এজন্য তার কোনো আক্ষেপও ছিল না। বরং আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন সেজন্য (প্রভুর দরবারে) সদা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল ছিল অর্থাৎ যা প্রয়োজন আল্লাহ্ (ইনশাআল্লাহ্) পূর্ণ করবেন। কোনো সমস্যায় নিপতিত হলে বলতেন, দোয়া করো আল্লাহ্ সমস্যা সমাধান করে দিবেন আর আল্লাহ্ সমস্যা সমাধান করেও দিতেন। তার ছেলে বলেন, আমাকে বার বার বলতেন মুরব্বী হিসেবে তোমার দায়িত্ব অনুধাবন করো এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করো। তার স্ত্রী বলেন, উনচল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবন আমাদের, আমি তার মধ্যে কখনো কোনো দুর্বলতা দেখি নি। যুগ-খলীফার সাথে গভীর ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল আর সন্তানদেরকেও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। সীরাতে মুস্তকীমে নিজেও চলতেন, সন্তানদেরকেও চালাতেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের দাম্পত্য জীবনে তিনি কখনো কারো কুৎসা করেন নি। শ্বশুরকূলের লোকদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। আমার মায়ের যখনই আমার প্রয়োজন পড়তো তিনি সানন্দে আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। প্যারাগুয়ের মুরব্বী আব্দুন্ নূর বাতেন সাহেব বলেন, কানাডাতে বিভিন্ন পদে থেকে তার (জামা'তের) সেবা করার সুযোগ হয়েছে। তার মাঝে অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কোনো দিক ছিল না। জামা'তের সেবায় গভীর আগ্রহী ছিলেন। যেখানেই যেতেন আবশ্যক দায়িত্ব জ্ঞান করে আগ্রহ ও ভালোবাসার সাথে পুরোপুরি দায়িত্ব পালন করতেন। প্যারাগুয়ে জামা'তের যুবকদের ওপর তার ব্যক্তিত্বের গভীর প্রভাব পড়েছিল। তিনি তাদেরকে ধৈর্য, দয়া ও আতিথেয়তা শিখিয়েছেন।

(এরপর শেষের পাতায়)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মানবীয় মুল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে আঁ হযরত(সাঃ) এর অনবদ্য ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত।

আঁ হযরত(সাঃ) এর মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা এবং সহিষ্ণুতার আরও একটি দৃষ্টান্ত এই রূপ। বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা বর্ণনা করেন যে সাহাল বিন হানিফ ও কায়েস বিন সায়াদ কাদসিয়া নামক স্থানে বসে ছিলেন।এমন সময় সেখান দিয়ে একটা জানাজা অতিক্রম করল। তারা দুজনে উঠে দাঁড়ায়। যখন তাদেরকে বলা হল যে সেটা অমুসলিমের শবদেহ , তারা দুজনে বলল যে একবার নবী করীম(সাঃ) এর পাশ দিয়ে একটি জানাজা অতিক্রান্ত হলে তিনি উঠে দাঁড়ান। তাঁকে(সাঃ) বলা হল যে এটা তো একজন ইহুদির জানাজা। প্রত্তুত্তরে রসুলে করীম(সাঃ) বললেন যে আলাইসাত নাফসান্অর্থাৎ সে কি মানুষ নয়। (সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েজ)

অতএব এটা হল সম্মান যা অন্য ধর্ম ও মানবতা উভয়ের প্রতি প্রদর্শন করা উচিত।এই অভিব্যক্তি ও দৃষ্টান্তর দ্বারাই ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই অভিব্যক্তির মাধ্যমেই একে অপরের প্রতি কোমল মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং এই ভাবাবেগের মাধ্যমেই ভালবাসা ও সম্প্রীতির এবং শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বর্তমানের জগতোন্মুখীদের কার্যকলাপের মত নয় যা পরিবেশে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু করতে সক্ষম নয়। আরও একটি বর্ণনায় রয়েছে যে 'খায়বর' বিজয়ের সময় তৌরাতের কিছু পুস্তক(পুঁথি) মুসলমানেরা পায়। ইহুদিরা আঁ হযরত(সাঃ) এর নিকট এই দাবি নিয়ে উপস্থিত হল যে , আমাদের পবিত্র গ্রন্থ আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। রসুলে করীম (সাঃ) সাহাবাদেরকে ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন।

(আল সীরাতুল হালবিয়া, বাব জিকরুল মাগাজিয়া)

ইহুদীদের নিজেদের অনুচিত চাল চলনের কারণে তারা শাস্তি পাচ্ছিল , তা সত্বেও আঁ হযরত(সাঃ) এটা সহ্য করলেন না যে শত্রুর সঙ্গেও এরূপ আচরণ করা হোক যার দ্বারা ধর্মীয় ভাবাবেগ আহত হয়।

এগুলি কিছু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘটনাবলীর বর্ণনা করলাম, এবং আমি উল্লেখ করেছিলাম যে মদিনায় একটি চুক্তি হয়।সেই চুক্তির অন্তর্গত আঁ হযরত(সাঃ) যে সকল শাখা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ,যে বর্ণনা আমরা পাই তার আমি বর্ণনা করব ,যে কিভাবে সেই পরিবেশে গিয়ে তিনি(সাঃ) সহিষ্ণুতার পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালান এবং সেই পরিবেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কি চাইতেন।যাতে পরিবেশে শান্তি বিরাজ করে এবং মানবতা মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত হয়। মদিনা পৌঁছানোর পর তিনি(সাঃ) ইহুদিদের সঙ্গে যে চুক্তি করেন তার কিছু শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১) মুসলমান ও ইহুদি একে অপরের সঙ্গে সহানুভুতি ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে বসবাস করবে।এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অন্যায় ও অত্যাচারপূর্ণ আচরণ করবেনা।(তা সত্বেও ইহুদিরা এই প্রচ্ছেদটিকে সর্বদা উলঙঘন করতে থেকেছে কিন্তু আঁ হযরত(সাঃ) সর্বদা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন। এমনকি যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন।)

২) দ্বিতীয় শর্ত এই ছিল যে , প্রত্যেক জাতির ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে।(মুসলমানরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও তোমরা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন।)

৩) তৃতীয় শর্ত এই ছিল যে, সকল বাসিন্দাগণের প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে, তাদের সম্মান করা হবে কিন্তু এমন ব্যক্তি ভিন্ন যে অত্যাচারী ও অপরাধী হবে।(এখানেও কোনও বিভেদ নেই । অপরাধী যেই হোক না কেন সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম, শাস্তি সে অবশ্যই পাবে। এবং সুরক্ষা প্রদান করা সকলের সম্মিলিত কাজ, সরকারের কাজ।)

৪) চতুর্থ শর্ত হল এই যে সকল প্রকারের ঝগড়া ও বিবাদ সমাধানের জন্য রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সম্মুখে উপস্থাপন করা হবে। এবং প্রত্যেক সিদ্ধান্ত আল্লাহ তায়ালার আদেশানুসারে গৃহিত হবে।(এখানে আল্লাহ তায়ালার আদেশের পরিভাষা হল এই যে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ধর্মীয় বিধান অনুসারে। তবে সিদ্ধান্ত অবশ্যই আঁ হযরত (সাঃ) এ সম্মুখে উপস্থাপিত হবে কেননা সেই সময় রাজ্যের সর্বাধিপতি আঁ হযরত(সাঃ) ছিলেন। এই কারণে তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত সেই ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী হবে। আর যখন ইহুদীদের কিছু সিদ্ধান্ত তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী হল তখন তার উপরই খ্রীষ্টান বা কিছু বিরোধীরা এই বলে আপত্তি করে যে এটা অত্যাচার। অথচ তাদের কথা অনুযায়ী তাদেরই শর্তাবলী অনুসারে সিদ্ধান্ত হয়েছিল।)

আরও একটি শর্ত ছিল যে " আঁ হযরত (সাঃ) এর অনুমতি ছাড়া কোনো পক্ষ যুদ্ধের জন্য বার হবে না। এই জন্য রাজ্যের মধ্যে থেকেই সেই রাজ্যের অনুগত থাকা আবশ্যক । এই যে শর্তটি রয়েছে এটা বর্তমানের জেহাদি সংগঠনগুলির জন্য পথ প্রদর্শক। অর্থাৎ যে রাজ্যে বসবাস করছে তার অনুমতি ছাড়া কোনো প্রকারের জিহাদ করতে পারবেনা , কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদিসেই সরকারি সেনা বাহিনীতে যোগ দেয় এবং সরকার যদি যুদ্ধ করে তবে সেটা ঠিক আছে।)

আরও একটি শর্ত এই ছিল যে , " যদি ইহুদি ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করে তবে একে অপরের সহায়তা করার জন্য তারা রুখে দাঁড়াবে।"(অর্থাৎ দুই জাতির মধ্যে যদি কোনো একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয় তবে অপর জাতিটির সহায়তা করবে। এবং শত্রুর সঙ্গে চুক্তির পরিস্থিতিতে মুসলমান ও অ মুসলিম দুই জাতি চুক্তির মাধ্যমে যদি কোনও উপকার ও লাভ পায় তবে তার থেকে প্রত্যেকে অংশ পাবে।) অনুরূপ ভাবে যদি মদিনার উপর কেনো আক্রমণ হয় তবে সম্মিলিত ভাবে তা প্রতিহত করবে।

আরও একটি শর্ত ছিল, " মক্কার কুরায়েশ ও তাদের সহযোগীদেরকে ইহুদিদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকারের আশ্রয় বা সাহায্য দেওয়া হবেনা।(কেননা মক্কার বিরোধীরাই মুসলমানদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেছিল। মুসলমানেরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই কারণে এই রাজ্যের বাসিন্দারা ঐ শত্রু জাতির সঙ্গে কোনো প্রকারের চুক্তি করতে পারবেন না , আর কোনো সাহায্যও গ্রহণ করবেনা।)

প্রত্যেক জাতি নিজেদের যাবতীয় খরচ নিজেরাই বহন করবে।"

এই চুক্তির দিক দিয়ে কোনো অত্যাচারী বা পাপাচারী ও বিশৃঙ্খলসৃষ্টিকারী শাস্তি পাওয়া থেকে বা তার প্রতিশোধ নেওয়া থেকে রক্ষা পাবেনা ।(যেরূপ পূর্বেও উল্লেখ হয়েছে যে , কোনও অত্যাচারী হোক , পাপী হোক বা দোষী হোক , শাস্তি সে অবশ্যই পাবে। আর এটা কোনো বিভেদ ছাড়াই হবে , সে মুসলমান হোক বা ইহুদী হোক বা আরও অন্য কেউ ।) (মুলাখিস আজ সীরাত খাতামাননাবীঈন)

অপর পক্ষে এই ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি (সাঃ) নাজরানের প্রতিনিধি মন্ডলকে মসজিদে নবুবীর মধ্যে উপাসনা করার অনুমতি দেন।তারা পূর্বের দিকে মুখ করে নিজেদের উপাসনা সম্পন্ন করে, যদিও সাহাবিদের ধারণা ছিল এটা করা উচিত নয়। তিনি (সাঃ) বললেন কিছু যায় আসেনা।তারপর নাজরানের বাসীদেরকে তিনি(সাঃ) যে সুরক্ষা পত্র দিয়েছিলেন সেটারও উল্লেখ পাওয়া যায়। সেটাতে তিনি (সাঃ) নিজের উপর অর্পিত এই দায়িত্বের কথা স্বীকার করেন যে মুসলমান সৈন্য বাহিনীর দ্বারা খ্রীষ্টানদের সীমারেখার সুরক্ষ করা হবে।(যা নাজরানের মধ্যে পড়ত) তাদের গীর্জা, উপাসনালয়,পান্থশালা সেটা যত দূর দূরান্তের এলাকায় বা শহরে , পাহাড়ে বা জঙ্গলে অবস্থিত হোক না কেন সেগুলিকে রক্ষা করা মুসলমানদের দায়িত্ব । তারা নিজেদের ধর্মমতানুসারে ইবাদত করার স্বাধীনতা পাবে, এবং তাদের উপাসনার স্বাধীনতাকে রক্ষা করাও মুসলমানদের কর্ত্তব্য। আঁ হযরত(সাঃ) বলেছেন যে যেহেতু এরা এখন মুসলমান রাজ্যের প্রজা তাই তাদের রক্ষা করা একারণেও আমার কর্ত্তব্য কারণ এরা এখন আমার প্রজা হয়ে গেছে।

পরে আরও আছে যে ,অনুরূপ ভাবে মুসলমানরা নিজেদের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে তাদেরকে(অর্থাৎ খ্রীষ্টানদেরকে) ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামিল করবেনা। তাদের পাদরী এবং ধর্মীয় নেতারা যে পদে রয়েছে সেখান থেকে অপসারিত করা হবেনা। অনুরূপভাবেইনিজেদের কাজ করতে থাকবে। তাদের উপাসানাগারে হস্তক্ষেপ করা হবেনা। সেগুলি কোনো পরিস্থিতিতেই ব্যবহারের আওতায় আনা হবেনা।সেখানে কোনো পান্থশালাও বানানো হবেনা বা কাউকে বসবাস করতে দেওয়া হবেনা কিম্বা তাদের অনুমতি না নিয়ে আরও অন্য কোনো কাজের উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হবেনা। ধর্মযাজক ও সন্নাসীরা যেখানেই থাকুক না কেন তাদের কাছ থেকে কোনো জিজিয়া কর বা খারাজ কর আদায় করা হবেনা। যদি কোনো মুসলমানের স্ত্রী খ্রীষ্টান হয় তবে ব্যক্তিগত ভাবে ইবাদতের বিষয়ে তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে । যদি কেউ নিজেদের ধর্মের পন্ডিতদের কাছে ধর্মীয় বিষয়ে কিছু জানার উদ্দেশ্যে যেতে চাই তবে সে যেতেপারে। গীর্জার বা অন্যান্য ধর্মীয়স্থলের মেরামতের বিষয়ে তিনি(সাঃ) বলেছেন যে , যদি তারা মুসলমানদের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান বা নৈতিক সহায়তা নিতে চাই তবে মুসলমানদের উচিত সহায়তা করা। কেননা এটা উত্তম জিনিস, আর এটা কোন ঋণ বা উপকার বলে গণ্য হবে না, বরং এই ধরণের সামাজিক সম্পর্ক বিস্তার ও একে অপরকে সহায়তার কাজ এই চুক্তিকে উন্নত করার একটা মাধ্যম হবে। (তালখিস আজ জাদে মুয়াদ ফি হুদা)

অতএব ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটা ছিল আঁ হযরত(সাঃ) এর মানদন্ড। তা সত্বেও তাঁর(সাঃ) উপর অত্যাচার করার এবং তরবারির শক্তিতে ইসলামের প্রসার ঘটানোর অপবাদ দেওয়া ঘোর অন্যায়পূর্ণ কাজ।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন:-"সুতরাং , যেহেতু আহলে কিতাব (খ্রীষ্টান ও ইহুদিরা) ও আরবের মূর্ত্তি উপাসকরা চরম পর্যায়ের কু- প্রথার বশবর্ত্তী হয়ে গিয়েছিল , তারা মন্দ কর্ম করে মনে করত যে সৎ কর্ম করেছে, অপরাধ করা থেকে বিরত হত না এবং সাধারণ শান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। তাই খোদা তায়ালা তাঁর নবীর হাতে রাজত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করে দরিদ্রদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। যেহেতু আরব দেশ লাগামহীন ছিল এবং লোকেরা কোনো সম্রাটের রাজত্বের অধীনে ছিলনা এই কারণে প্রত্যেকটি গোত্র অত্যন্ত বন্ধনহীন ও দুঃসাহসিকতাপূর্ণ জীবনযাপন করত।"(কোনো আইন ছিলনা কেননা তারা কারও অধীনে ছিলনা) "এবং যেহেতু যেহেতু তাদেও জন্য শাস্তিপ্রদানের আইন ছিলনা এই কারণে তারা প্রতিনিয়ত অপরাধের সীমাতিক্রম করতে থাকত। সুতরাং খোদা তায়ালা তাদের করুণা প্রদর্শনপূর্বক আঁ হযরত (সাঃ) কে সেই দেশে রসুল করে প্রেরণ করলেন , শুধু তাই নয় তাকে সে দেশের সম্রাটও বানিয়ে দিলেন। এবং কুরান

এরপর ১৪ পাতায়....

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

পৃথিবীর পরিত্রাতা

মূল-আতাউল মুজীব লোন, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত ও প্রিন্সিপাল জামিয়া আহমদীয়া

অনুবাদক : মির্জা মহম্মদ এনামুল কবীর (মুয়াল্লিম সিলসিলা আহমদীয়া)

আল ফযল -এর বিশেষ সংখ্যার জন্য প্রবন্ধ লেখার জন্য আমার কাছে আকাঙ্খা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর আমি মনে করি, রসুল করীম (সা.)-এর সুউচ্চ মহান মর্যাদাকে মহিমামণ্ডিত করার জন্য এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হতে চলেছে, এতে প্রবন্ধ লেখা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। তাই আমি আমার সাম্প্রতিক ব্যস্ততা এবং অসুস্থতা উপেক্ষা করে সংক্ষিপ্ত একটি প্রবন্ধ লেখা সমীচীন মনে করি।

রসুল করীম (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি দিক এমনই অসাধারণ সৌন্দর্যময় যে, মানুষ আশ্চর্য হয়ে ভাবে কোন দিকটি গ্রহণ করব এবং কোনটি ত্যাগ করব আর নির্বাচন করতে গিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু আমি এই যুগের প্রয়োজনীয়তাকে দৃষ্টিপটে রেখে আমার প্রবন্ধের জন্য আঁ হযরত (সা.) এর জীবনের সর্বোত্তম অংশটিকে নির্বাচন করেছি। অর্থাৎ তিনি কিভাবে পৃথিবীকে সেই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছেন যা চিরকাল পৃথিবীর গলার মালা হয়ে ছিল আর সেটি হল নারীদের দাসত্ব। রসুল করীম (সা.) আর আবির্ভাবের পূর্বে প্রতিটি দেশেই নারীদেরকে দাস তথা সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হত আর তাদের দাসত্ব পুরুষদের উপরও প্রভাব না ফেলে থাকতে পারত না। কেননা দাসীদের সন্তানেরা স্বাধীনতার মর্ম পূর্ণত ধারণ করতে পারে না।

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, চিরকাল নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য কিম্বা চারিত্রিক গুণাবলীর বলে বহু পুরুষের উপর রাজত্ব করে এসেছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না। কেননা এই অর্জন অধিকার হিসেবে ছিল না, বরং ব্যতিক্রম হিসেবে ছিল এবং এমন ব্যতিক্রমী স্বাধীনতা কখনও যথাযথ আবেগ তৈরী করার কারণ হতে পারে না।

আজ থেকে সাড়ে তেরোশ বছর পূর্বে রসুল করীম (সা.) এর আবির্ভাব হয়েছিল। সেই সময় পর্যন্ত কোন ধর্ম বা জাতিতে নারীরা এমন স্বাধীনতা পেত না যেটাকে তারা নিজেদের অধিকার হিসেবে ব্যবহার করতে পারত। অবশ্য এমন অনেক দেশও হয়তো ছিল যেখানে কোন নিয়মকানুন না থাকার সুবাদে তারা যাবতীয় প্রকারের বিধিনিষেধের বন্ধন থেকে মুক্ত ছিল, কিন্তু সেটাকেও স্বাধীনতা বলা যায় না, ভবঘুরেদের উদ্দেশ্যহীন জীবন বলা যায়। সেটাকেই আমরা স্বাধীনতা বলতে পারি যা সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিয়ম-কানুন মেনে অর্জিত হয়, সেই সব নিয়ম-কানুন ভেঙ্গে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটাকে আর যাইহোক স্বাধীনতা বলা যায় না। কেননা তা উদ্যম সৃষ্টির কারণ হতে পারে না বরং উদ্যমহীনতা তৈরীর কারণ হয়।

রসুল করীম (সা.)এর যুগে এবং এর পূর্বে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, এতটাই যে, তারা নিজেদের সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না, তাদের স্বামীকে তার সম্পত্তির মালিক বলে মনে করা হত। তাদেরকে পিতার সম্পদ থেকে অংশ দেওয়া হত না,স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবেও তাকে বিবেচনা করা হত না। যদিও কিছু কিছু দেশে তারা তাদের জীবিত থাকা অবস্থায় সে নিজের সম্পত্তি নিজেই অভিভাবক হত। পুরুষের সঙ্গে যখন তার নিকাহ হয়ে যেত,তখন হয় তাকে চিরকালের চুক্তি-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেত, কোনভাবেই তার থেকে পৃথক হওয়ার সুযোগ থাকত না, অথবা তার স্বামীর অধিকার থাকত তার থেকে পৃথক করে দেওয়া, কিন্তু স্বামী থেকে নিজে পৃথক হওয়ার অধিকার তার ছিল না, সে তাকে যতই কষ্ট সহ্য করতে হোক না কেন। স্বামী যদি তাকে ছেড়ে দিত এবং কোন সম্পর্ক না রাখত অথবা কোথাও পালিয়ে যায় তবে তার অধিকার রক্ষার কোন আইন নির্ধারিত ছিল না। আর ধরে নেওয়া হত যে, নারী তার সন্তানদের নিয়ে পরিশ্রম করে নিজের এবং সন্তানদের প্রতিপালন করবে-আর এটাকেই নারীর কর্তব্য বলে মনে করা হত। আর স্বামী নিজের স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে মারধর করবে, কিন্তু স্ত্রী তার বিরুদ্ধে কোন টুঁ পর্যন্ত করবে না- স্বামীদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদি স্বামী মারা যেত, সেক্ষেত্রে কিছু কিছু দেশে স্ত্রীকে স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সম্পত্তি মনে করা হত। তারা নিজেদের ইচ্ছে মত অনুগ্রহ হিসেবে কিম্বা মূল্যের বিনিময়ে তার বিয়ে দিয়ে দিত পারত। অনেক স্থানে তাদেরকে স্বামীর সম্পত্তি বলে মনে করা হত। কোন কোন স্বামী নিজেদের স্ত্রীকে বিক্রি করে দিত বা জুয়া বা বাজিতে হেরে যেত আর এটাকে তাদের অধিকারের মধ্যেই মনে করা হত। স্ত্রীদের নিজের সন্তানের উপর কোন অধিকার থাকতে পারে এমন কথা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য হত না। ধর্মের বিষয়েও মনে করা হত যে তাদের কোন মর্যাদা নেই, চিরস্থায়ী নেয়ামতে তাদের কোন অংশ থাকবে না। এর পরিণামে স্বামীরা স্ত্রীদের সম্পত্তি ধ্বংস করে ফেলত এবং তাদেরকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিত। নারীর তার সম্পদ থেকে দান-খয়রাত বা আত্মীয়-স্বজনদের সেবা করার অধিকার ছিল না। যে পিতামাতার সঙ্গে তাদের স্নেহ ও ভালবাসার এক নিবিড় সম্পর্ক, তাদের সম্পত্তি থেকেও মেয়েদেরকে বঞ্চিত করা হত। অথচ যেভাবে ছেলেরা তাদের স্নেহ-ভালবাসার দাবিদার, অনুরূপব দাবিদার মেয়েরাও। যে সব মা-বাবা এই ত্রুটিপূর্ণ রীতি দেখে মেয়েদেরকে নিজেদের জীবদ্দশায় কিছু দিয়ে যেত, তাদের পরিবারে অশান্তি শুরু হয়ে যেত। কেননা, ছেলেরা যদিও একথা ভাবত না যে বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর তারা তাদের সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে, তবে একথা অবশ্যই অনুভব করত যে, তাদের মা-বাবা তাদের তুলনায় মেয়েদেরকে বেশি দিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে, যে স্বামীর সঙ্গে পূর্ণ ঐক্যের সম্পর্ক বন্ধন থাকত, তার সম্পত্তি থেকেও তাকে বঞ্চিত রাখা হত। স্বামীর দূর দূরান্তের আত্মীয়-স্বজনরা পর্যন্ত সেই সম্পদের উত্তরাধিকারী হত। অথচ, স্ত্রী- যে কিনা তার অর্ধাঙ্গীনি, আজীবনের সঙ্গীনি হিসেবে তার কাছে থাকত, স্বামীর উপার্জনে যার পরিশ্রম ও কাজের অনেক অবদান থাকত, তাকেই কিনা স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত রাখা হত অথবা স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বধায়ক নিযুক্ত করা হত, কিন্তু তাকে সেই সম্পত্তির কোন অংশে অধিকার জমানো থেকে বঞ্চিত রাখা হত, সে সম্পত্তির আয়কে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারত ঠিকই, কিন্তু সম্পত্তির কোন অংশ নিজের কাজে লাগাতে পারত না। অনুরূপভাবে অনেক নিত্য প্রবাহমান সদকায় নিজের ইচ্ছে মত অংশ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকত। স্বামী তার উপর যতই অত্যাচার করুক, তার থেকে পৃথক হতে পারত না কিম্বা যে সব জাতিতে স্বামীদের থেকে স্ত্রীরা পৃথক হতে পারত, তাদের জন্য এমন শর্ত আরোপ করা হত যে অনেক সতী নারী সেই বিচ্ছেদের মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করত। যেমন-বিচ্ছেদের শর্ত ছিল-স্বামী কিম্বা স্ত্রীর ব্যাভিচার প্রমাণ করা। আর সব থেকে বড় অন্যায় ছিল, অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীদের জন্য স্বামীদের সঙ্গে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠত তখন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে কেবল পৃথক থাকার অধিকার দেওয়া হত যেটা বাস্তবে আরও বড় শাস্তি হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। কেননা এভাবে সে উদ্দেশ্যহীন হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়। আবার এমনটাও হত যে, স্বামীরা যখন চাইত স্ত্রীদেরকে পৃথক করে দিতে পারত। কিন্তু স্ত্রীদের জন্য কোন পরিস্থিতিতেই বিচ্ছেদ চাওয়ার কোন অধিকার ছিল না। স্বামী যদি তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন না করে এমনিই ছেড়ে দিত কিম্বা দেশান্তরী হয়ে তার কোন সংবাদ না নিত, তবে স্ত্রীকে আজীবন স্বামীর অপেক্ষা করতে বাধ্য করা হত, কিন্তু নিজের জীবন দেশ ও জাতির জন্য ভালভাবে কাটানোর কোন অধিকার ছিল না। বিবাহ জীবন তার জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দের না হয়ে দুর্বিষহ হয়ে দেখা দিত। তাকে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের দায়িত্বও সামলাতে হত অপরদিকে স্বামীর অপেক্ষাও করতে হত। স্বামীর কর্তব্য অর্থাৎ পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য উপার্জন করাও তার কাঁধে এসে পড়ত এবং মহিলা হিসেবে সন্তানের দেখাশোনা ও প্রতিপালনের দায়িত্বও তারই থাকত। একদিকে মর্মবেদনা, অপরদিকে সাংসারিক দায়িত্ব-এই সব কিছু সেই অসহায় নারীর জন্য নিত্যনৈমত্তিক বিষয় ছিল। স্ত্রীকে মারধর করা স্বামীর বৈধ অধিকারের মধ্যে গণ্য করা হত। স্বামীর মৃত্যুর পর তার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত কিম্বা অন্য ব্যক্তির কাছে মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়া হত। এমনকি স্বামীরা নিজেরাও তাদের স্ত্রীদেরকে বিক্রি করে দিত। পাণ্ডবদের ন্যায় মহান যুবরাজরা নিজেদের স্ত্রীকে জুয়া খেলায় হেরে গিয়েছিল আর দেশের আইনের সামনে দ্রোপদীর ন্যায় সতী রাজকন্যা টুঁ পর্যন্ত করতে পারে নি। সন্তানের শিক্ষা কিম্বা লালন-পালনের বিষয়ে মায়েদের কোনও মতামত নেওয়া হত না আর সন্তানদের প্রতি তাদের কোনও অধিকার স্বীকার করা হত না। মা-বাবার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তানদেরকে বাবার হাতে তুলে দেওয়া হত। স্বামীর জীবদ্দশায় হোক বা মৃত্যুর পর- পরিবারের সঙ্গে স্ত্রীর কোন সম্পর্ক-ই গণ্য করা হত না। স্বামী যখন খুশি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিত। আর তখন সে আশ্রয়হীন হয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াত।

রসুল করীম (সা.) এর মাধ্যমে এই সমস্ত অন্যায়-অত্যাচারকে সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে। তিনি (সা.) সিদ্ধান্ত প্রদান করেন- খোদা তা'লা আমাকে বিশেষভাবে নারীর অধিকার রক্ষার দায়িত্ব অর্পন করেছেন। আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি, পুরুষ ও নারী মানুষ হিসেবে সমান। তারা যখন সম্মিলিতভাবে কাজ করে, তখন যেভাবে নারীদের উপর পুরুষদের কিছু অধিকার বর্তায়, অনুরূপভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের কিছু অধিকার বর্তায়। মেয়েরাও সেভাবেই সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে যেভাবে পুরুষরা হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী সানন্দে উপহার হিসেবে তাকে কিছু না দেয়, পুরুষদের অধিকার নেই তাদের স্ত্রীর সম্পদ ব্যবহার করার। তাদের কাছ থেকে জোর করে সম্পদ নেওয়া কিম্বা এমনভাবে নেওয়া অনুচিত যেখানে সন্দেহ থাকে যে স্ত্রী হয়তো লজ্জাবশত তাকে নিষেধ করতে পারছে না। স্বামীও যদি তাকে কখন কোন উপহার দেয় সেটি স্ত্রীরই সম্পদ হবে, স্বামী সেটি ফেরত নিতে পারবে না। সে নিজের মা-বাবার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, যেভাবে পুত্র সন্তানরা মা-বাবার সম্পদের অধিকারী হয়। তবে পুরুষদের উপর যেহেতু পরিবারের দায়িত্ব থাকে এবং মেয়েদের উপর শুধু সংসার সামলানোর দায়িত্ব থাকে, তাই সে পুরুষদের অর্ধেক অংশ পাবে। অনুরূপভাবে মা-ও পুত্রের সম্পদ থেকে অনুরূপ অংশ পাবে যেভাবে পিতা পেয়ে থাকে। যদিও পরিস্থিতি সাপেক্ষে এবং দায়িত্ব ভিন্নতা অনুসারে সে কখনও পিতার সমান আবার কখন তার থেকে কম অংশ পাবে। সন্তান থাকুক বা না থাকুক স্বামীর মৃত্যুান্তে তার সম্পদেরও অধিকারী হবে। কেননা তাকে অন্যের ভরসায় ফেলে দেওয়া যায় না। নিঃসন্দেহে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। পুরুষ ও মহিলার পরস্পরের প্রতি যারপরনায় বিতৃষ্ণা তৈরী হওয়ার পর এই বন্ধন ভঙ্গ করার যদিও সুযোগ আছে, কিন্তু এটি অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ। তবে যদি পুরুষ ও মহিলার পরস্পরের প্রকৃতিতে ভয়াবহ বৈপরিত্য প্রমাণিত হয় অথবা ধর্মীয় বিষয়, শারিরিক কোন বিষয়, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও চারিত্রিক বৈষাম্য সত্ত্বেও তাকে সেই অঙ্গীকার রক্ষার তাগিদে তার জীবন নষ্ট করতে এবং জীবনের লক্ষ্য ভুলে যেতে বাধ্য করা যায় না। যখন এমন মতবিরোধ তৈরী হয় এবং স্বামী ও স্ত্রী এ বিষয়ে

এরপর ১১ পাতায়....

জাতীয় সংবাদ

দারুল আমান কাদিয়ান এ ‘মখযনে তাসাভীর’ প্রদর্শনী এবং সংস্কারের উদ্বোধন

আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় কাদিয়ান দারুল আমান এ আল বালাগ ভবনে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়া (আই.) এর মঞ্জুরীক্রমে দোয়ার মাধ্যমে ‘মখযানে তাসাবীর কাদিয়ান’ এর নতুন প্রদর্শনীর উদ্বোধনী হয়। মখযানে তাসাবীর এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি ১৭ই ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে আসরের নামাযের পর বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় মৌলানা জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেব সদর আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে জামাতের পদাধিকারী এবং জলসা সালানা কাদিয়ানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আগত বিদেশের কিছু অতিথিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় যার পর মাননীয় মখযনে তাসাভীর বিভাগের ইনচার্জ প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা এবং সংস্কারের পটভূমিকা শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। এরপর মাননীয় জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেব ইজতেমায়ী দোয়া করান। এরপর দর্শকগণ মখযানে তাসাভীর পরিদর্শন করেন। জামাতীয় বিভিন্ন চিত্র জামাতের ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ আধার। আর এই সব ঐতিহাসিক এবং বিরল চিত্র দেখে আমাদের ঈমানেও শক্তির সঞ্চার হয়, যখন আমরা দেখি যে আল্লাহ্ তা’লা কিভাবে প্রত্যেক যুগে খলীফাদের মহান আধ্যাত্মিক নেতৃত্বে জামাতকে উন্নতি দান করেছেন। এই উদ্দেশ্যেই কাদিয়ান দারুল আমানে খিলাফতে খামিসার আশিসমণ্ডিত যুগে হুযুর আনোয়ারের দিক-নির্দেশনা এবং মঞ্জুরীক্রমে ২০১২ সালে ‘আল-বালাগ’ ভবনে প্রথম বার মখযনে তাসাভীর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে সাম্প্রতিক চিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভুত হয়। এছাড়াও পুরোনো জীর্ণ ফ্রেমগুলিও বদলে ফেলার পরিকল্পনা ছিল। সেই ভাবনা থেকেই সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) এর মঞ্জুরীক্রমে ‘মখযানে তাসাভীর’ প্রদর্শনীর সংস্কার করার মাধ্যমে নতুন প্রদর্শনীর প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ২০২২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে এই নতুন প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। মখযানে তাসাভীর কাদিয়ান এর এই নতুন প্রদর্শনীতে জামাতের ইতিহাস বিজড়িত চিত্রাবলীকে আকর্ষণীয় এবং সুবিন্যস্তভাবে সাজানো হয়েছে। এই প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে যেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর সুসংবাদ-বাহক সন্তানদের ছবি, অনুরূপভাবে খলীফা এবং তাদের খিলাফতকালে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষীর বিভিন্ন ছবি এবং খিলাফতে খামসার বরকতময় যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর ছবি, বিশেষ করে হুযুর আনোয়ারে সাম্প্রতিক সফরসমূহ এবং অন্যান্য কর্মব্যস্ততার ছবিও এই প্রদর্শনীর শ্রীবৃদ্ধি করছে। আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় এই প্রদর্শনী স্থানীয় আহমদী এবং অতিথিদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে আর জলসা সালানা কাদিয়ান ২০২২ এর সময়ও অতিথিবর্গ এই প্রদর্শনী থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন এবং এই প্রদর্শনী ভীষণভাবে সমাদৃত হয়েছে। এর জন্য আল্লাহ তা’লার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তা’লা এই নতুন প্রদর্শনী স্থাপনাকে সার্বিকভাবে কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং আহমদ্যী ও অ-আহমদীদেরকেও এর থেকে লাভবান হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

(আতাউল মুজীব লোন, ইনচার্জ প্রেস এন্ড মিডিয়া বিভাগ, ভারত)

কাদিয়ানে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত- এর পক্ষ থেকে Women in Islam- এর উপর জলসা অনুষ্ঠিত হল।

৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২২ কাদিয়ানের সরায়ে খিদমত ভবনে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারতের পক্ষ থেকে হুযুর আনোয়ার (আই.) মঞ্জুরীক্রমে ‘ওমেন ইন ইসলাম’ বিষয়ের উপর একটি জলসার আয়োজন করা হয়। লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত তাদের সংগঠনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এ বছর জুবিলি হিসেবে উদযাপন করছে, যার অধীনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। এই জলসাও জুবিলি মঞ্জুরকৃত অনুষ্ঠানমালার একটি অংশ ছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য পাঞ্জাবের অসংখ্য অ-আহমদী মহিলাদের আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং অধিকার সম্পর্কে অমুসলিমদের কে অবগত করানো। কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সংবর্ধনামূলক বক্তব্যের পর ৫জন অতিথিনী নিজেদের চিন্তাধারা ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন। ভদ্রমহিলারা একথা ব্যক্ত করেন যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে মেয়েকে বোঝান মনে করা হয় না। বরং কন্যা সন্তানের জন্ম হলে আনন্দ করা হয়। কুরআন করীমেও পুরুষ ও মহিলাকে সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে পর্দার নিয়ম রয়েছে নারীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও নিরাপত্তাবোধ তৈরী করার জন্য। এছাড়াও আগত অতিথিনীরা লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারতের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অ-আহমদী মহিলাদেরকে স্মারক প্রদান করা হয় এবং Women in Islam- পুস্তকও উপহার দেওয়া হয়। সব শেষে সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্, ভারত তাঁর ভাষণে ইসলামের নারীর মর্যাদা এবং অধিকারসমূহ সম্পর্কে বলেন যে, কিভাবে ইসলামের প্রবর্তক হযর মহম্মদ মুস্তফা (সা. এবং এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পৃথিবীতে মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি উপস্থিত সকল অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উপস্থিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ভীষণ আনন্দিত ছিলেন এবং তারা জামাতের উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জামাতের প্রয়াসের প্রশংসা করেন। আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় এই অনুষ্ঠান ব্যপক সফল হয়। আল্লাহ্ তা’লা এই অনুষ্ঠানের পুণ্যময় ও সদূরপ্রসারী পরিণাম প্রকাশ করুন। আমীন।

কলকাতায় আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে শান্তি সম্মেলনের আয়োজন।

৩রা ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে কলকাতা জামাতের পক্ষ থেকে একটি শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কলকাতা ভারতের একটি অন্যতম মহানগর। শহরের দ্যা পার্ক হোটেল এর এই শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এবছর শান্তি সম্মেলনের থিম ছিল Fundamentals of Establishing Lasting Peace.

এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন চিন্তাধারা সঙ্গে যুক্ত একশর বেশি অতিথি অংশগ্রহণ করেন যাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজনীতিক ও সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, ছাত্রবৃন্দ, বিভিন্ন ধর্মের নেতা, বিভিন্ন জনসেবা মূলক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কোলকাতা জামাতের আমীর সাহেব। কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মাননীয় মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব, জামাত আহমদীয়া কলকাতা অতিথিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার সময় বাংলায় জামাতের পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি তাঁর পরিচিতিমূলক বক্তব্যে উপস্থিতবর্গের সামনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আগমণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণিত মানবীয় সহানুভুতি এবং সার্বজনীন শান্তির শিক্ষা তুলে ধরেন এবং সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) সারা বিশ্বে শন্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন সেকথারও উল্লেখ করেন। এই শান্তি সম্মেলনে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ারের শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জামাতের প্রচেষ্টা এবং বিশ্বশান্তির জন্য সোনালী নীতি সংবলিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এই তথ্য চিত্রে জামাত আহমদীয়া ভারতের পক্ষ থেকে ভারতের বিভিন্ন অংশে জনসেবামূলক কাজের বিবরণও দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে খাকসার সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত তথা একজন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করে আর Fundamentals of Establishing Lasting Peace থিমের উপর ২০১৮ সালে যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে একটি বক্তৃতা উপস্থাপন করি। অনুরূপভাবে উপস্থিত অতিথিদেরকে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে খোদা তা’লার দিকে প্রত্যাবর্তনের এবং প্রত্যেক স্তরে ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সম্মেলনে আগত সম্মানীয় অতিথিদেরকেও নিজেদের পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পর শান্তি প্রতিষ্ঠায় জামাতের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। সব শেষে কলকাতার নায়েব আমীর সাহেব সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এরপর আমীর সাহেব কলকাতা সভাপতির ভাষণ দান করে দোয়া করান। এরপর অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সম্মেলন উপলক্ষ্যে জলসা হলের এক কোণে জামাতের বুক স্টলও বসানো হয় যা থেকে অংশগ্রহণকারীরা উপকৃত হন। অতিথিদেরকে জামাতের বই-পুস্তক দেওয়া হয়। শান্তি সম্মেলনের সংবা ৬টি বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় এবং তিনটি আঞ্চলিক নিউজ চ্যানেলে প্রচারিত হয়। আল্লাহ্ তা’লা এই শান্তি সম্মেলনের পুণ্যময় ও সুদূরপ্রসারী পরিণতি দান করুন। আমীন।

রাজধানী দিল্লীতে শান্তিসম্মেলন

১০ই ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লীতে জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে পিস সিম্পোজিয়াম আয়োজিত হয়। এই সম্মেলন আয়োজিত হয় Constitutional club of India

ভবনে। এবছর পিস সিম্মোজিয়ামের থিম ছিল True & Sustainable Peace.

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন নাযের নাশর ও ইশাআত, কাদিয়ান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রালয়ের জন বার্লা সাহেব। অনুরূপভাবে হাইকোর্টের উকিল, ইউনিভার্সিটির ভায়েস চান্সেলর, ধর্মীয় নেতা, বিভিন্ন জনসেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানরা অংশগ্রহণ করেন।কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দিল্লীর নায়েব জেলা আমীর অতিথিদের সংবর্ধনা জানিয়ে জামাতের পরিচিতি তুলে ধরেন। জামাতের পরিচয় তুলে ধরার সময় তিনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনেরও ব্যবস্থা ছিল যার মাধ্যমে

(এরপর শেষ পাতায়....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

“সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, ‘কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।” *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

একমত হয় যে তারা আর একত্রে থাকতে পারবে না, তখন তারা পারস্পরিক সম্মতিতে সেই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আর যদি পুরুষ এমনটি চায় আর স্ত্রী না চায় আর পরস্পরের মধ্যে যদি কোন মীমাংসা না হয় সেক্ষেত্রে একটি সালিসি সভা তদের মাঝে মীমাংসা করে দিবে, যার মধ্যে দু'জন সদস্য থাকবে, একজন পুরুষের পক্ষ থেকে আর একজন সদস্য স্ত্রীর পক্ষ থেকে। কিন্তু তারা যদি এই সিদ্ধান্ত নেয় যে স্বামী ও স্ত্রীর এখনও কিছু সময় একত্রে থাকা উচিত, তবে তাদের নির্দেশিত পথে পুরুষ ও মহিলা এক সঙ্গে থাকবে। কিন্তু তাতেও যদি সামঞ্জস্য তৈরী না হয় তবে পুরুষ তার স্ত্রীকে পৃথক করে দিতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে সে স্ত্রীকে যে সমস্ত সম্পদ বা উপহার দিয়েছিল তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না। বরং হক মোহরও পুরো শোধ করতে হবে। এর বিপরীতে স্ত্রী যদি পুরুষের থেকে পৃথক হতে চায় তবে সে কাজির কাছে আবেদন করবে আর কাজি যদি দেখে এর পিছনে চারিত্রিক দুর্বলতার কোন হাত নেই তবে কাজি তাদের বিচ্ছেদের নির্দেশ দিতে পারে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর কাছে স্বামীর যে সব সম্পদ ও মোহর সঞ্চিত আছে তা ফিরিয়ে দিবে আর যদি স্বামী তার স্ত্রীর বিশেষ অধিকার না দিয়ে থাকে বা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দেয় বা তার বিছানা পৃথক করে দেয় তবে এর সময় নির্ধারিত হওয়া উচিত। আর সে যদি চার মাসের বেশি সময় ধরে এই একই পন্থা অবলম্বন করে তবে তাকে নিজের সংশোধন করতে কিম্বা তালাক দিতে বাধ্য করা উচিত। আর যদি পুরুষ স্ত্রীকে সংসার ও অন্যান্য খরচ দেওয়া বন্ধ করে দেয় বা কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, এবং স্ত্রী কোন খোঁজ খবর না রাখে তবে তাদের নিকাহ ,,,,,,,, বলে পরিগণিত হবে। (ইসলামের ফিকাহবিদগণ তিন বছরের সময় বর্ণনা করেছেন) আর স্ত্রীটিকে অন্যত্র বিবাহ করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। আর স্বামীকে সব সময় তার স্ত্রী ও সন্তানের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বামী তার স্ত্রীকে যথোচিত সীমা পর্যন্ত সতর্ক করার অধিকার রাখে। কিন্তু সেই সতর্কীকরণ যখন শাস্তির রূপ নেয় তখন এরজন্য কাউকে সাক্ষী রাখা এবং অপরাধ প্রকাশ্যে আনা এবং সাক্ষীর উপর শাস্তি ভিত্তির রাখা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর শাস্তিও যেন গুরুদণ্ড না হয়। স্ত্রী স্বামীর কোন সম্পত্তি নয়, সে তাকে বিক্রি করতে পারে না, কিম্বা সেবিকার মতও রাখতে পারে না। স্ত্রী পুরুষের খাওয়া দাওয়ার সঙ্গী আর তার সামর্থ মত তার প্রতি আচরণ করা উচিত।আর যে শ্রেণীর স্বামী হবে তার থেকে কম মর্যাদা স্ত্রীকে দেওয়া যাবে না। স্বামীর মৃত্যুর পর তার আত্মীয় স্বজনদের তার প্রতি কোন অধিকার বর্তায় না,বরং সে তখন স্বাধীন হয়ে যায়। ভাল ছেলে দেখে সে বিবাহ করতে পারে, একাজে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না বিশেষ কোন স্থানে আবদ্ধ হয়ে থাকতে তাকে বাধ্যও করা যাবে না। কেবল চার মাস দশ দিন পর্যন্ত সে স্বামীর ঘরে অবশ্যই থাকবে যাতে সেই সময়ের মধ্যে সমস্ত অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যায় যা তার স্বামীর অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের অধিকারের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। স্ত্রীকে তার স্বামীর মৃত্যুর পর, যদি না তার ব্যক্তিগত অধিকার হয়, স্বামীর বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া উচিত নয়, যাতে এই সময়ের মধ্যে সে নিজের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে পারে। স্বামী যদি অসন্তুষ্ট হয় তবে সে নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে যাক, স্ত্রীকে যেন ঘর থেকে বের না করে। কেননা বাড়িকে মেয়েদের দখলে বলে মনে করা হয়। সন্তান প্রতিপালনে মহিলাদেরও অংশ রয়েছে। তাদের থেকে পরামর্শ নেওয়া উচিত আর সন্তানের দিক থেকে তাকে কোন কষ্ট দেওয়া উচিত না। দুধ পান করানো, শিশুর দেখাশোনা করা ইত্যাদি বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত আর যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য পারস্পরিক সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় দেখে বিচ্ছেদের পথ বেছে নেয় তবে শিশুরা মায়ের কাছেই থাকবে। কিন্তু যখন তারা বড় হবে তখন শিক্ষাদীক্ষার জন্য পিতার হাতে তুলে দেওয়া হবে। যতদিন শিশু তার মায়ের কাছে থাকবে ততদিন পিতা সন্তানের খরচ জোগাবে, বরং সন্তানের পিছনের মায়ের যে সময় এবং পরিশ্রম ব্যয় করতে হয় তারও আর্থিক সাহায্য স্বামীকে দেওয়া উচিত।

মহিলারা স্থায়ী মর্যাদার অধিকারীর আর যাবতীয় প্রকার ধর্মীয় শিক্ষাও সে লাভ করতে পারে। মৃত্যুর পরও তারা উচ্চ মানের পুরস্কার লাভ করবে। আর এই পৃথিবীতেও প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে অংশ নিতে পারে। এক্ষেত্রে তার অধিকার তেমনভাবে সুরক্ষিত থাকবে যেভাবে পুরুষদের থাকে।

এই ছিল সেই শিক্ষা যা রসুলুল্লাহ্ (সা) সেই সময় নিয়ে এসেছিলেন যখন এর সম্পূর্ণ বিপরীত ধারার শিক্ষা ও চিন্তাধারা পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল। তিনি (সা.) এই সব আদেশের দ্বারা নারী জাতিকে দাসত্বের সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন যার মধ্যে তারা হাজার হাজার বছর আটকে পড়েছিল। যে দাসত্বের শৃঙ্খলে প্রত্যেকটি দেশেই তাদেরকে বাধ্য করা হত আর এর পরাধীনতার জোয়াল প্রত্যেকটি ধর্ম তাদের গলায় পরিয়ে রেখেছিল। এক ব্যক্তি একই সময়ে এই সুদীর্ঘকালের বন্দীত্বদশাকে ছিন্ন করেছেন এবং সমগ্র জগতের নারী জাতিকে স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়ে দিয়েছেন আর মায়েরে স্বাধীন করে তাদের সন্তানদেরকেও দাসত্বের চিন্তাধারা থেকে রক্ষা করেছেন এবং উচ্চ ও উৎকৃষ্ট চিন্তাধারা এবং উদ্যমশীলতার স্পৃহা বিকশিত হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু পৃথিবী এই সেবার কোন মূল্যয়ন করে নি। তারা উপকারকে অত্যাচার আখ্যায়িত করল। তালাক ও খুলাকে বিশৃঙ্খলা, উত্তরাধিকার বন্টনকে পরিবারের বিনাশ এবং নারীর স্থায়ী অধিকারকে সাংসারিক জীবন ধ্বংসের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করল। আর এভাবেই যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল আর তেরোশ বছর ধরে নিজের অন্ধত্বের কারণে সেই চাক্ষুষমানের কথা নিয়ে ঠাট্টা করতে থেকেছে আর এর শিক্ষাকে প্রকৃতির নীতি-বিরুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে এসেছে। অবশেষে সময় হল খোদার বাণীর সৌন্দর্য প্রকাশিত হওয়ার আর যারা সংস্কৃতি ও শিষ্টাচারের দাবিদার ছিল তারা রসুল করীম (সা.) এর সেই শিক্ষার অনুসারী হয়ে ওঠার যা তাদেরকে শিষ্টাচার শেখায় আর তাদের মধ্যে প্রত্যেক প্রশাসন দ্বারা এক এক করে নিজেদের আইন-কানুন ফেলার এবং রসুল করীম (সা.) নির্দেশিত নীতির অনুসরণ করার।

ইংরেজি আইন অনুসারে তালাক ও খুলার জন্য কোন এক পক্ষের ব্যাভিচার এবং সেই সঙ্গে অত্যাচার ও শারিরিক নির্যাতন অনিবার্য ছিল। ১৯২৩ সালে সেই আইনে বদল আসে আর শুধু ব্যাভিচারকেও তালাক ও খোলার কারণ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।

নিউজিল্যাণ্ডে ১৯১২ সালে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সাত বছর যাবৎ উন্মাদনাগ্রস্ত ব্যক্তির স্ত্রীর নিকাহ ভঙ্গ করা যেতে পারে আর ১৯২৫ সালে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, স্বামী বা স্ত্রী যদি পরস্পরের অধিকার প্রদান না করে তবে সেক্ষেত্রে তালাক বা খুলা হতে পারে আর তিন বছর পর্যন্ত স্বামীর খোঁজ না পাওয়া গেলে তালাককে বৈধ গণ্য করা হয়েছে। (অবিকল ইসলামী ফিকাহর অনুকরণ করা হয়েছে, কিন্তু তেরোশ বছর ধরে ইসলামের উপর আপত্তি করার পর)

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড প্রদেশে পাঁচ বছর ধরে উন্মাদনাকে তালাকের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাসমেনিয়ায় ১৯১৯ সালে এই মর্মে আইন পাস হয় যে, ব্যাভিচার, চার বছর পর্যন্ত খোঁজখবর না নেওয়া, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, তিন বছর পর্যন্ত সঙ্গী বা সঙ্গীনির প্রতি মনোযোগ না দেওয়া এবং বন্দীত্বদশাকে তালাকের কারণ হিসেবে গণ্য করা হবে। ভিক্টোরিয়ায় ১৯২৩ সালে আইন পাস করা হয় যে, স্বামী যদি তিন বছর খোঁজ খবর না নেয়, ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকে, সংসার খরচ না দেয় বা কঠোরতা করে, বন্দীদশা, শারিরিক নির্যাতন অথবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে ব্যাভিচার, বা ভারসাম্যহীনতা বা কঠোরতা এবং অশান্তি করা তালাক ও খুলার কারণ হতে পারে।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় উপরোক্ত আইনগুলি ছাড়াও অন্তঃসত্তা মহিলাদের বিবাহকেও ত্রুটিপূর্ণ আখ্যা দিয়েছে। (ইসলামও এটিকে অবৈধ আখ্যা দেয়)

কিউবা দ্বীপে ১৯১৮ সালে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ব্যাভিচারে বাধ্য করা, মারামারি, গালাগালি, শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া, মাতলামি, জুয়োয় অভ্যস্ত,অধিকার প্রদান না করা, সংসার খরচ না দেওয়া, সংক্রামক ব্যধি বা পারস্পরিক সম্মতিকে তালাক ও খুলার যথেষ্ট কারণ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।

ইতালিতে ১৯১৯ সালে আইন তৈরী হয় যে, মহিলা তার সম্পত্তির অধিকারী হবে আর তা থেকে দান খয়রাত করতে পারবে বা সেটিকে বিক্রি করতে পারবে। (সেই সময় ইউরোপে মহিলাদেরকে তাদের সম্পত্তির মালিক বলে মনে করা হত না)।

মেক্সিকো ও আমেরিকাতেও উপরোক্ত কারণগুলিকে তালাক ও খুলার জন্য যথেষ্ট কারণ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে পারস্পরিক সম্মতিকেও এর বৈধতার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।এই আইনটি সেদেশে পাস হয় ১৯১৭ সালে।

পর্তুগালে ১৯১৫ সালে, নরওয়েতে ১৯০৯ সালে, সুইডেনে ১৯২০সালে, সুইজারল্যাণ্ডে ১৯১২ সালে এমন আইন তৈরী করা হয়েছে যার মাধ্যমে তালাক ও খুলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুইডেনে পিতাকে সন্তানের বয়স ১৮ বছর হওয়া পর্যন্ত তার যাবতীয় খরচ বহন করতে বাধ্য করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন যদিও এখনও একথাই বলে যে সন্তানের উপর পিতার অধিকার বর্তায়, কিন্তু কার্যত ইসলামী নীতির অনুসরণে এর মধ্যে সংশোধন শুরু হয়েছে এবং বিচারক মহিলার আবেগ অনুভুতিকে মর্যাদা দিতে শুরু করেছে এবং পুরুষকে খরচাদি দিতেও বাধ্য করা হচ্ছে। কিন্তু এখনও এই আইনে অনেক ত্রুটি রয়েছে। পুরুষদের অধিকার বেশি কঠোরভাবে রক্ষা করা হয়েছে, মহিলাদেরকে তাদের সম্পত্তির উপর অধিকারও পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু কিছু প্রদেশে এই আইনও পাস করা হয়েছে যে, স্বামী প্রতিবন্ধী হয়ে পড়লে স্ত্রীর জন্যও স্বামীর খরচ বহন করা অনিবার্য হবে।

মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হচ্ছে আর রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে তাদের পরামর্শ নেওয়ার পথও উন্মুক্ত হচ্ছে। কিন্তু এই সব বিষয়গুলি রসুল করীম (সা.) এর বাণীর তেরোশ বছর পর হয়েছে আর এখনও কিছু হওয়া বাকি আছে। অনেক দেশেই এখনও পর্যন্ত মহিলাকে তার মাতা-পিতা এবং স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করা হয় না। এছাড়াও আরও অনেক মানবাধিকারভুক্ত বিষয় রয়েছে যেখানে ইসলাম বাকি পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব এখন ইসলামের এই পথিকৃত হওয়াকে স্বীকার করে নি। তবে সেই যুগ দূরে নয় যেদিন এই সকল বিষয়ে রসুল করীম (সা.)-এর দিকনির্দেশনাকে জগতবাসী গ্রহণ করবে, যেভাবে তারা অন্যান্য বিষয়ে গ্রহণ করেছে আর নারীজাতির স্বাধীনতার জন্য আঁহযরত (সা.) এর সংগ্রাম পরিপূর্ণরূপে তার প্রভাব ও পরিণাম প্রকাশ করবে।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

খাতামান্নাবীঈন (সা.)

[মূল-ডক্টর মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.)]

পৃথিবীতে শত সহস্র সুদর্শন পুরুষ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং শত সহস্র এখনও বিদ্যমান, লক্ষ লক্ষ বিদ্বান গত হয়েছে আর লক্ষ লক্ষ বিদ্যমান। সর্বগুণ সম্পন্ন অনেকে গত হয়েছে এবং এখনও অনেকে বিদ্যমান। দ্বীনদার এবং খোদারমুখী মানুষ সব যুগেই আছে এবং চিরকালই থাকবে। বাদশাহ, বিজয়ী, আবিষ্কারক, দার্শনিক- মোটকথা সকল বিষয়ে উৎকর্ষের অধিকারীরা কখনও পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায় নি আর হারাবেও না। কিন্তু আমি এমন এক ব্যক্তির সন্ধানে ছিলাম যার মধ্যে সকল মানবীয় গুণ সমাবিষ্ট হয়েছে, তার মাঝে সকল গুণাবলীর পরাকাষ্ঠা ঘটেছে, এবং সেই সকল গুণাবলী দ্বারা অন্যদেরকেও গুণান্বিত করতে পারে। কৃপণ দর্শনধারীর নামকেও আমি ঘৃণা করি। আর কুৎসিত দর্শন পরোপকারীর থেকেও আমি যোজন দূরে অবস্থান করি। অহংকারী যেন না হয়, আমাকে দেখে মৃদু হাসবে, বরং নিজে থেকে ডাকবে। তার সাহচর্যে আমার হৃদয় উষ্ণ ও বক্ষ আলোকিত হয় আর তার নামের স্বাদে আমার জিহ্বা অন্যান্য যাবতীয় স্বাদকে ভুলে যায় আর তার স্মৃতি আমার অন্ধকারময় মস্তিষ্ক জান্নাতের বাগানসম হয়ে ওঠে।

আমার চেতনা, দৃষ্টি এবং কল্পনা অতীত ও বর্তমানকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, যাকেই দেখেছি তার মাঝে কোনও না কোনও ত্রুটি দেখেছি, কোন না কোন দুর্বলতা দেখেছি। এমনিতেও আমি বন্ধুমহলে ছিদ্রান্বেষী নামে পরিচিত, ত্রুটির উপরই সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টি যায়। এই কারণে যেখানে অন্যরা দাঁড়িয়ে পড়ে, সেখানে আমি মুখ বাঁকিয়ে এগিয়ে যায়। হে আল্লাহ্! সারা জগতে এমন কোন দর্শনধারীও কি আছে, যে কি না ত্রুটিমুক্ত, যার মাঝে সকল মানবীয় গুণ পরাকাষ্ঠায় পৌঁছেছে। নিশ্চয় আছে। আমি বাদশা দেখেছি কিন্তু বিলাসী এবং লোভী, দার্শনিক ও বিদ্বান দেখেছি কিন্তু অকর্মা। সুদর্শন পুরুষ দেখেছি কিন্তু অসভ্য, যোদ্ধা দেখেছি কিন্তু অত্যাচারী, স্বার্থপর কবি দেখেছি কিন্তু আস্ফালনকারী এবং কাপুরুষ, লেখক দেখেছি কিন্তু জ্ঞানহীন ও অসার, সংস্কারক দেখেছি কিন্তু নিরস, নীতিবান দেখেছি কিন্তু অসম্পূর্ণ। মোটকথা সারা বিশ্বে ঘুরে ফিরে সকলকে দেখেছি- হতাশা প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল- কিন্তু মনের অভিলাষা পূর্ণ হয় নি। ঠিক সেই সময় কেউ যেন বলল, নবীকুলের দিকেও দৃষ্টি দাও। জগতের বাহ্যিক চাকচিক্যের দিকে যেও না। তাঁদের প্রতি দৃষ্টি দিলে সেই হতাশা ক্রমশ দূর হতে থাকল, অদ্ভুত সব মানুষের দেখা মিলল, যাদের কাজ সুন্দর, কথা সুন্দর, চেহারা সুন্দর, স্বভাব সুন্দর- যাদের কোন কোণে কোন অন্ধকার ছিল না। আমি আশায় বুক বাঁধলাম। সকল নবীর জীবনী পরখ করতে শুরু করলাম। অবশেষে আমার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। অর্থাৎ যার সন্ধান ছিল তা খুঁজে পেলাম। কোত্থেকে? আরবের তপ্ত মরুভূমি আর রুক্ষ পর্বতের খনি থেকে। যেখানে না ছিল চেতনা, না ছিল বিবেক-বুদ্ধি, না ছিল হিদায়াত, না ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতি, না ছিল রাষ্ট্র না ছিল কোন শাসন ব্যবস্থা। আর যার সন্ধান পেলাম তাকে কি নামে সম্বোধন করব- পূর্ণ-মানব না কি মহামানব-তা বুঝে উঠতে পারছি না। তাঁর সৌন্দর্যে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তাঁর অনুগ্রহের সামনে বিদ্বেষভাবাপন্নদের বড় অসহায় দেখাচ্ছে। নাম জানতে পারলাম 'মুহাম্মদ' (সা.) । সুবহানাআল্লাহ্! আমিও তো 'মুহাম্মদ' এর সন্ধানেই ছিলাম। অর্থাৎ যার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই, যে কি না শুধুই গুণাবলীর সমাহার, যিনি সত্য ও সুন্দর, যাঁর মধ্যে রয়েছে প্রশংসাযোগ্য যাবতীয় গুণ প্রত্যেক সৌন্দর্য এবং মানবীয় উৎকর্ষ পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছে, যার তুলনা অতীতেও ছিল না আর ভবিষ্যতেও হবে না। সেই নামের প্রতি উৎসর্গিত। কি অসাধারণ প্রজ্ঞাই না ছিল তাঁর নামকরণের মাঝে!

মানবতার পরাকাষ্ঠার মান

জগতের সর্ব মহান মানবের জন্য আমার মানদণ্ড কি ছিল? সে কোন কোন ঔৎকর্ষ ও অনুগ্রহের সমষ্টি হবে? আসুন দেখা যাক–

১) বাহ্যিকভাবে সর্বাঙ্গ সুন্দর, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার অধিকারী। (২) বংশের দিক থেকে সম্ভ্রান্ত। ৩) নৈতিক আচরণের ঔৎকর্ষে সুসজ্জিত এবং যে যাবতীয় নৈতিক গুণ প্রকাশের সুযোগও পেয়েছে। ৪) পরম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। ৫) পরিপূর্ণ শিক্ষা কিম্বা জ্ঞান-বৃদ্ধি। ৬) ব্যপক আকর্ষণ ও পবিত্রকরণ শক্তি। ৭) পরম সাফল্য।৮) পরম সমবেদনা ও মানব-হিতৈষা। ৯) পরম ভালবাসা ও আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক। ১০) কোন লম্পট বা দুর্বৃত্ত নয়, বরং এমন ব্যক্তি যার কাজকর্ম, প্রতিটি কথা, ওঠাবসা, এবং জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পারি বর্ণনাকারীদের নিরবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলের মাধ্যমে । ১১) যে হবে জীবনের মূর্তপ্রতীক এবং অন্যদের নিজের জীবনীশক্তি দ্বারা প্রভাবিত করে। নিকৃষ্ট ও পশুসুলভ জীবন নয়, বরং শাশ্বত জীবন, যে-জীবনের মধ্যে রুহুল কুদুস অবতীর্ণ হয়ে এই কৃষ্ণ-মৃত্তিকাকে আলোর স্থানে পরিণত করে। আমি এই সমস্ত গুণাবলী কেবল মহম্মদ (সা.)-এর মাঝেই পেয়েছি।

বাহ্যিক তথা দৈহিক সৌন্দর্য।

মাঝারি উচ্চতা, মাঝারি গড়ন, রক্তিম উজ্জ্বল বর্ণ, প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণ ও টিকালো নাসিকা, দীর্ঘ গ্রীবা, বিরাট মস্তক, প্রশস্ত বক্ষ, গাঢ় কালো আঁখি, সুগন্ধময় ঘর্ম, অতি কোমল ত্বক, ক্ষিপ্র চলার গতি,অত্যন্ত সুমিষ্ট ও মনোহর বচন। থেমে থেমে কথা বলতেন আর বাক্যের প্রত্যেকটা অংশ পৃথক করে বলতেন আর উঁচু স্বরে কথা বলতেন, অপ্রয়োজনে কথা বলতেন না। অট্টহাসি হাসতেন না, কেবল মৃদু হাসতেন। লোকের সঙ্গে হাস্যবদনে আলাপ করতেন। রুচিসম্মত ও শোভন পোশাক পরিধান করতেন। সুগন্ধি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত থাকতেন। সব সময় মিসওয়াক (দাঁতন) করতেন। আনন্দের মুহূর্তে তাঁর মুখে শোভা পেত করত হেমের ন্যায় উজ্জ্বল আভা। সব সময় চনমনে থাকতেন। আপাদ-মস্তক তাঁর দেহে কোন খুঁত ছিল না। দুর্গন্ধময় বস্তুকে ভীষণভাবে ঘৃণা করতেন। আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম নামী জনৈক ইহুদী আঁ হযরত (সা.) কে দেখেই বলেছিলেন, 'খোদার নামে শপথ করে বলছি, এটা মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না।' জাবির বলেন, তাঁর মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ছিল। বারাআ (রা.) বলেন, আমি আঁ হযরত (সা.) এর চায়তে সুদর্শন ব্যক্তি কাউকে দেখি নি। আনাস (রা.) বলেন, আমি 'দিবা' এবং 'হারীর' (একপ্রকার ঘাস)ও এর চেয়ে নরম দেখি নি। মৃগনাভি এবং অম্বরের মাঝেও তাঁর শরীরের চেয়ে বেশি সুগন্ধ ছিল না। যে গলি দিয়ে অতিক্রান্ত হতেন সেটি সুরভিত হয়ে উঠত। তিনি আয়েনা দেখে দোয়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ كَمَا اَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ

হে আল্লাহ্! যেভাবে তুমি আমার দৈহিক গঠনকে সুন্দর করেছ অনুরূপভাবে আমার চরিত্রকেও উন্নত কর।

চরম বিচক্ষণতা

যদিও আচার আচরণের ঔৎকর্ষ থেকেই বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় আর যার আচরণ ও চরিত্র অত্যুন্নত, তার বুদ্ধিমত্তা নিঃসন্দেহে উচ্চমানের হবে তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু অন্যদের থেকেও তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতা অন্য মাত্রার ছিল। যেমন, জগত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা তাঁর পরম বিচক্ষণতার পরিচায়ক। লক্ষ লক্ষ নিবেদিত প্রাণ প্রস্তুত আছে, সমগ্র আরব তাঁর হাত মুঠোয়, যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ লাভ হচ্ছে, কিন্তু যখন তাঁর মৃত্যু হল, রেখে গেলেন কেবল একটি তহবন্দ (লুঙ্গি) এবং তাঁর পবিত্র মরদেহের উপর চাপানো ছিল একটি তল্লি লাগানো কম্বল । লৌহবর্মটি এক ইহুদির কাছে বন্ধক রাখা ছিল। সম্পদ হিসেবে কোন দাস-দাসী বা কোন অর্থকড়ি রেখে যান নি। নাগাড়ে দুই মাস পর্যন্ত সময়ও অতিক্রান্ত হয়েছে যখন কি না তাঁর বাড়ির উনুনে হাঁড়ি চড়ে নি। কখনও উৎকৃষ্ট ও ধনীসুলভ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন না। সারাটি জীবন অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণভাবেই কাটিয়েছেন। এটাই তাঁর পরম বিচক্ষণতার প্রমাণ।

তাঁর চরম বিচক্ষণতার আরও একটি দৃষ্টান্ত হল সৈন্য ব্যবস্থা। যুদ্ধের ময়দানে সব সময় সেনাদেরকে এমনভাবে সারিবদ্ধভাবে সাজাতেন এবং এমনভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতেন যে, শত্রুদের সংখ্যাধিক্য ও নিজেদের সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও বিজয় তাঁরই হত। ব্যতিক্রম শুধু ওহদের যুদ্ধ, যেখানে কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। আর সেটাও হয়েছিল তাঁর কথার অবাধ্য হওয়ার কারণে।

তাঁর বিচক্ষণতার আরও একটি দৃষ্টান্ত হল তিনি একাকী দাঁড়িয়েছেন আর যাবতীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও একাই সমগ্র আরবের উপর বিজয় লাভ করেছেন। আর যখন তাঁর মৃত্যু হল তখন উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম সমগ্র আরব তাঁর অধীনস্ত ছিল।

তাঁর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমতার আরও উদাহরণ হল, তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে নয় বরং শান্তি ও চুক্তির মাধ্যমে সেই দেশ ও জতিকে জয় করেছিলেন। তাঁর সমস্ত বিজয় এসেছে প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশল দ্বারা। বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয়, আত্মীয়তার কারণে তাঁর প্রতি জাতির আনুগত্য, চুক্তির কারণে ইসলামের শান্তি লাভ- এই সব নমুনা তাঁর বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন প্রয়োজন পুরো করার জন্য উপযুক্ত লোকের নির্বাচন, ইহুদী এবং মুনাফিকদের মাঝের বিবাদ বিসম্বাদ দূর করার জন্য যথপোযুক্ত প্রস্তাব, মানুষের মন জয় করার প্রতি বিশেস সচেতনতা- ইত্যাদি বিষয়গুলি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ, বিশেষ করে এমন এক দেশের প্রেক্ষাপটে যেখানে না ছিল কোন রাজনীতিক ভিত্তি, না ছিল কোন জাতিগত ঐক আর না ছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

হুদায়বিয়ায় ১৪০০ জনের মতামত তাঁর বিরুদ্ধে ছিল। সেদিন বৃক্ষতলে প্রত্যেকেই প্রাণপণ অঙ্গীকার করে বয়আত করেছিল। আর তাদের ধারণা ছিল, চাপের মুখে নতি স্বীকার করে চুক্তির করার অর্থ ইসলামের বিনাশ স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু তাদের মধ্যে কেবল একজনই প্রকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন যিনি সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে পদক্ষেপ নেন এবং বাহ্যত সকল দিক থেকে অন্যায্য চাপ স্বীকার করে সন্ধি করেন। কিন্তু পরের ঘটনাক্রম বলে দিচ্ছে যে, সেটি লাঞ্ছনা ছিল না, বরং ইসলামের বিজয় এবং প্রকৃত সম্মান এবং আত্মপ্রকাশের সূচনা হয়েছিল সেই চুক্তিপত্রের মাধ্যমেই যার কারণে উভয় পক্ষ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করেছিল আর ইসলাম নিজের যুক্তি প্রমাণ এবং সত্যিকার আধ্যাত্মিক প্রভাব দ্বারা প্লাবনের ন্যায় প্রসারিত হওয়া শুরু করেছিল।

উমর বিন খাত্তাব (রা.) এর ন্যায় চিন্তাবিদ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও কি কেউ ছিল তা ইসলাম বিরোধীদের জিজ্ঞাসা কর। তারা একবাক্যে একথা স্বীকার করবে যে, উমর এই পৃথিবীর একজন অতুলনীয় চিন্তাবিদ এবং বুদ্ধিমানদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। অতঃপর এই উমরকেই আঁ হযরত (সা.)-এর সভায় বার বার ভুল করতে এবং শিখতে দেখ, এরপর গুরু ও শিষ্যের তুলনা করলে দেখা যাবে উমর ছিলেন একটি বিন্দু মাত্র সেই সমুদ্রের তুলনায়।

এক উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশে আঁ

হযরত (সা.)-এর জন্ম।

উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশও মানুষের একটা বড় সৌন্দর্য। বহু দৈহিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্য মানুষ বংশ পরম্পরায় লাভ করে থাকে। ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ্ , নবীগণের পিতা এবং ধর্ম সংক্রান্ত জাতিসমূহের আদিপুরুষ। এছাড়া তাঁর বংশের প্রধান শাখা অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল এর বংশ, এরপর সেই বংশের সব থেকে সম্মানীয় জাতি কোরায়েশ। এরপর কোরায়েশদের মধ্য থেকে সব থেকে সম্মানীয় বনু হাশিম এরপর এর মধ্যে আব্দুল মোতালেব এর ন্যায় সর্দার -এর পৌপুত্র, আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র এবং আমিনার কলেজার টুকরো কেনই বা সারা জগতেরর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও সব থেকে বেশি সম্ভ্রান্ত বংশের হবে না। স্বাধীন জাতি, স্বাধীন দেশ, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র গৃহের ছায়ায় প্রতিপালিত, দেখতে অবিকল ইব্রাহিম সদৃশ। সম্মানীয় ব্যক্তির পুত্র সম্মানীয়, সম্মানীয় ব্যক্তির পুত্র সম্মানীয় সম্মানীয় ব্যক্তির পুত্র সম্মানীয়। সেই নবী হলেন খলীলের দোয়া, মূসার সদৃশ, মসীহার সুসংবাদ (সা.)। বস্তুত যে বলেছে- 'আনা সৈয়্যদে উলদে আদাম'- যথার্থই বলেছে।

সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র

তিনি নিজেই দাবি করেছেন- ***'বুয়েসতু লি-উতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক'***। আল্লাহ্ তা'লার বাণী একথা সত্য প্রমাণিত করেছে যে إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ । (অর্থাৎনিশ্চয় তুমি এক মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত) যৌবনের দিনগুলির বিষয়ে হযরত খাদিজা (রা.) সাক্ষী দেন যে, আপনি হলেন সেই ব্যক্তি যে কি না আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন এবং আতিথেয়তা করেন। আর যে সমস্ত অতুলনীয় নৈতিকগুণাবলী রয়েছে সেগুলি সবই আপনার মাঝে বিদ্যমান এবং প্রত্যেক বিপদের সময় আপনি মানুষের জন্য বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যান। আপনি কি ধ্বংস হতে পারেন? মৃত্যুর পর তাঁর অর্ধাঙ্গিনী হযরত আয়েশা (রা.) সাক্ষী দেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ' কুরআন করীম যে সমস্ত বিষয়কে মন্দ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে সেগুলি তাঁর মধ্যে ছিল না এবং যেগুলি সম্পাদনের আদেশ করেছে তিনি সেই সব কাজই করতেন। এছাড়া সমগ্র জাতি তাঁকে 'সাদিক' সত্যবাদী এবং 'আমীন' আমানত রক্ষাকারী উপাধি দিয়েছিল। কুরআন করীম আজ পর্যন্ত পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছে فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ আমার নবুয়্যতের পূর্বে কোন পাপ বা মন্দকর্ম যদি থেকে থাকে তবে তা প্রমাণ কর। পারস্য সম্রাটের দরবারে কুফফারদের নেতা এবং কোরায়েশদের সেনাপতি আবু সুফিয়ান অকপটে স্বীকার করে যে, আমরা আজ পর্যন্ত কখন এই ব্যক্তিকে মিথ্যা বলতে শুনিনি।

তাঁর প্রতিটি গুণের কথা উল্লেখ করলে তা গ্রন্থের আকার নিবে। দুই-তিনটি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

বীরত্ব

হুনায়েন এর যুদ্ধের সময় শত্রুদের তিরন্দাজদের আক্রমণে সঙ্গীসাথিরা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, কিন্তু তিনি একাকী শত্রুদের সামনে অগ্রসর হতে থাকেন এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা দিতে থাকেন যে, আমি সেই নবী, যার মধ্যে কোন মিথ্যা নেই, আমি আব্দুল মুতালেব এরই সন্তান। একটি যুদ্ধে তিনি একা একস্থানে ঘুমিয়ে পড়েন। শত্রুদের নেতা সেখানে পৌঁছে গিয়ে তরবারি উঁচিয়ে তাঁকে ঘুম থেকে তোলে এবং বলে, বল এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? বীরত্বের মূর্তপ্রতীক শুয়ে শুয়ে বললেন, 'আল্লাহ্'। আর তাঁর সেই দাপট এবং ভীতির কারণে শত্রুর হাত থেকে তরবারি মাটিতে পড়ে যায়।

আলি (রা.)এর মত খোদার সিংহ বলেন, আঁ হযরত (সা.) সব সময় যুদ্ধের ময়দানে সব থেকে বিপজ্জনক স্থানে থাকতেন আর তাঁর আশপাশে তারাই দাঁড়াতে পারত যারা বীরযোদ্ধা আর শত্রুদের ঘোর আক্রমণের সময় আমরা তাঁর আশ্রয়ে আসতাম।

ক্ষমা ও দয়া

২১ বছর দিন রাত্রি অত্যাচার সহ্য করার পর আঁ হযরত (সা.) মক্কায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন। কাবা প্রাঙ্গণে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর বড় সর্দার এবং কুফারদের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁর সামনে নিজেদের পেশ করছে। আঁ হযরত (সা.) বললেন, বল তোমাদের সঙ্গে কি আচরণ করা উচিত? তারা নিজেদের বিবশতা ও অসহায় অবস্থা দেখে বলতে বাধ্য হয়, আপনি ন্যায়পরায়ণ এবং দয়ালু, যা করবেন ভালই করবেন। আদেশ দেওয়া হয় যাও তোমরা সকলে সকলে স্বাধীন। তোমাদের কোন শাস্তিই দেওয়া হবে না, শুধু তাই নয়, বরং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য কোন ভর্ৎসনাও করব না। প্রাণের শত্রু আবু জাহল এর পুত্র মুসলমান হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হলে আদেশ করা হল তার পিতার নামে কেউ যেন কোন নিন্দা না করে। কেননা, স্বাভাবিকভাবেই এতে তার ছেলে কষ্ট পাবে। তিনি চাইলে এক এক করে প্রত্যেকের মুণ্ডচ্ছেদ করতে পারতেন, কিন্তু ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় ক্ষমা ও দয়ার এমন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলেন যার নজির পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।

তায়েফের ভবঘুরে ছেলেরা কয়েক মাইল পর্যন্ত তাঁর উপর পাথর বর্ষন করতে করতে তাঁকে ধাওয়া করে। তিনি বলেন, আমার জ্ঞান ছিল না যে আমি কেথায় যাচ্ছি। আপাদমস্তক রক্তরঞ্জিত হয়ে পড়েছিল। ঐশী আদেশ এল,' যদি চাও আমি এখনই আযাব নাযেল করব'। তিনি বললেন, না। আমি আশা করি, এদেরই বংশধরদের মধ্য থেকে এমন মানুষের জন্ম হবে যারা এক খোদার ইবাদত করবে।

উহদের ময়দানের ঘটনা। তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছিল। গালে লৌহবর্ম ঢুকে গিয়েছিল। সামনের চারটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। সেই সময় তিনি দোয়া করছেন, হে আমার প্রভু! তুমি আমার এই জাতিকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, এরা নির্বোধ তাই আমার বিরোধিতা করছে।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আজীবন তিনি কখনও নিজের কারণে কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি।

তিনি (সা.) দুই যুগই দেখেছেন। প্রথম যুগ ছিল যৌবন, পরাধীনতা, বিপদ, বিরোধিতা এবং দারিদ্র। এরপর আসে বিজয়, সাম্রাজ্য, সম্মান ও ধন-সম্পদ এর যুগ। দুই যুগেই তিনি তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। যা দেখে পৃথিবী আশ্চর্য হয়েছে। প্রথম যুগে লজ্জাশীলতা, পবিত্রতা, সততা, আমানত রক্ষা, ধৈর্য, সম্ভ্রম, স্বল্পে তুষ্টি, অবিচলতা, নির্ভীক প্রচার, দৃঢ় সংকল্প ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আর দ্বিতীয় যুগে দয়া, করুণা, ক্ষমাশীলতা, বদান্যতা, অবিচলতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, অন্যের দোষত্রুটি উপেক্ষা, আইনের অনুবর্তিতা, অঙ্গীকার রক্ষা, কোমলতা, বিনয় এবং জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বিমুখতা এবং একজন উন্নত প্রতিবেশী হয়ে থাকা-ইত্যাদি অনেকের গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যার সমস্ত কিছু বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা

জ্ঞান মানুষকে অসাধারণ সৌন্দর্য দান করে, শুধু তাই নয়, বরং এটিই মানবতার গন্তব্য। জ্ঞানই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। এমন জ্ঞান-পিপাসা যে আজীবন খোদার কাছে رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا প্রার্থনা করে এসেছেন। জ্ঞানের অতল সমুদ্র দেখতে হলে কুরআন ও হাদীস অধ্যায়ন কর। এরপর তাঁর বাণীসমগ্রের দিকে দৃষ্টি দাও যেগুলির প্রতিটি বাক্যাংশে জ্ঞানভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে। এরপর তাঁর জীবনের দিকে দৃষ্টি দাও- একাধারে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ সেনাপতি, বক্তা, পথপ্রদর্শক, নিদান দাতা, বিচারক, শিক্ষক, স্বামী, পিতা, চিন্তাবিদ, প্রচারক- বস্তুত জীবনের কোনও অংশ এমন ছিল না যেখানে তাঁর পরম ঔৎকর্ষ প্রকাশিত হয় নি। এছাড়া তাঁর দেওয়া প্রতিটি নির্দেশে ছিল প্রজ্ঞা। এছাড়া তিনি ছিলেন জ্ঞানের এমন সমুদ্র, ইসলামের প্রতিটি অংশ যাঁর কথা ও কাজের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। আর আজও তাঁর প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ হয়ে চলেছে। এরপর কিয়ামত, বরযখ, হাশর, নশর, জান্নাত ও দোযখের বিস্তারিত জ্ঞান এবং সর্বোপরি জরুরী আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী এবং নামাবলীর জ্ঞান যা পৃথিবীর কোথাও ছিল না।

শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা

যে শিক্ষা ও শরিয়ত তিনি পৃথিবীর জন্য এনেছেন তার বিশেষত্ব এমন যা অন্য কোন শিক্ষার মধ্যে নেই। এই শিক্ষা সহজবোধ্য, বিশ্বজনীন, পরিপূর্ণ ও যুক্তিগ্রাহ্য। এই চারটি বিশেষত্ব পৃথিবীর অন্য কোন উন্নত থেকে উন্নতর শরিয়ত বা শিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায় না, হয়তো সেগুলির মধ্যে কঠিন এবং অবাস্তবায়নযোগ্য শিক্ষা বা সেগুলি এসেছে বিশেষ কোন জাতি বা দেশের জন্য কিম্বা সেই শিক্ষা অসম্পূর্ণ বা অযৌক্তিক, জোর করে মানতে বাধ্য করা হয়, সেই শিক্ষার সঙ্গে যুক্তিযুক্ত প্রমাণের কোন সম্পর্ক বর্ণনা করা হয় নি।

অসাধারণ আকর্ষণ শক্তি অর্থাৎ পবিত্রকরণ শক্তি।

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُونَ হযরত মূসা (আ.)-এর মান্যকারীরারা বলেছিল এবং ৩০ টাকার বিনিময়ে নিজেদের খোদাবন্দকে ধরিয়ে দেওয়া এবং চার সিপাহীর ভয়ে তিন বার মসীহ নাসেরীর উপর অভিসম্পাত করা- এই হল পৃথিবীর দুই ক্ষমতাশালী নেতাদের সাহর্চলাভকারী সাহাবাদের দৃষ্টান্ত। আর অন্যান্য ধর্মের অবস্থান এই দুইয়ের নীচেই। কিন্তুআঁ হযরত (সা.)এর সাহাবাগণ প্রকৃত আত্মত্যাগ এবং জীবনদানের যে নমুনা প্রদর্শন করেছেন তার সহস্রাংশও আমরা ইতিহাসের কোথাও দেখতে পাই না।

মুনাফিক আব্দুল্লাহ্ বিন সলুল আঁ হযরত (সা.)এর মর্যাদার বিরুদ্ধে কিছু কথা বলেছিল। তার ছেলে সে কথা জানতে পেরে হুযুর (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল- হে রসুলুল্লাহ্! আপনি যদি আদেশ করেন তবে আমি নিজে আমার পিতার মুণ্ডচ্ছেদ করব। যদিও আমি পিতার অনেক সেবা করি। উহদের যুদ্ধের সময় সাহাবাগণ আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যতার সমর্থনে যে আত্মোৎসর্গীকরণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন তা বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য। একবার হযরত উমর (রা.) জানতে পারলেন যে, আঁ হযরত (সা.) কে তাঁর সহধর্মিণীগণ অসন্তষ্ট করেছেন। সেই সময় তিনি (সা.) উপরের পৃথক কক্ষে ছিলেন। হযরত উমর (রা.) কুশল সংবাদ জানতে এসেছিলেন। দ্বাররক্ষী তাঁকে ভিতরে যেতে বাধা দিলে তিনি সেখান থেকেই ডাক দেন, 'হে রসুলুল্লাহ্! উমর তার হাসফার নামে সুপারিশ নিয়ে আসে নি, আদেশ করলে হাসফার শিরচ্ছেদ করে আপনার চরণে নিবেদন করতে পারি। বস্তুত মহম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার এক উন্মাদনা ছিল যা সকল সাহাবাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই কারণেই তাঁরা আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতিটি কথা, কাজ, ওঠাবাসা সব কিছুকেই তারা দেখেছিল উন্মাদনার দৃষ্টিতে এবং সেই ভাবেই আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন নবুয়ত রূপী প্রদীপের চারপাশে ভিড় জমানো পিপীলিকার দল আর তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির জীবন্ত নিদর্শন। অতএব, প্রমাণিত হল যে, যেমনটি তাঁর দৈহিক ও নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের ছিল, অনুরূপে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিতেও ছিল অসাধারণ আকর্ষণ ও প্রভাব।

মদ ছিল আরবের মজ্জাগত, প্রতিটি বাড়িতে তৈরী হত। আর কমকরে প্রত্যহ পাঁচবার পান করা হত। আঁ হযরত (সা.)-এর ঘোষক নির্দেশ পেয়ে ঘোষণা করতে বের হয় যে, আজ থেকে মদ নিষিদ্ধ। তৎক্ষণাৎ মদিনাতে যতগুলি মদের হাঁড়ি ছিল সব উল্টে দেওয়া হয়। সেদিন মদিনার অলিগলিতে বৃষ্টির পানির মত মদ বইছিল, এরপর আর কেউ মদের সন্ধান পায় নি। সেই সব মাতালরা কোথায় হারিয়ে গেল! লোকেরা বাসন কোসন পর্যন্ত ভেঙে

ফেলে। যাদের শিরায় রক্তের বদলে মদ বইত তাদের মুখ থেকে কেউ কখনও এর নামও শোনে নি। একাকী ও নিঃসঙ্গ ও অক্ষর পরিচয়হীন এক ব্যক্তি আরবদের সেই সব একগুঁয়ে, মুর্খ, মুশরিক, মিথ্যার উপাসক, মিথ্যাবাদী, দস্যু, নরহন্তারক, চোর, ব্যাভিচারী, আত্মসাৎকারী, বিশ্বাসভঙ্গকারী, নাস্তিক, লাঞ্ছনার পাত্র, বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের অতি স্বল্প সময়ের মাধ্যে মুত্তাকি, পুণ্যবান, সত্যপরায়ন, বিচক্ষণ , জ্ঞানী, সভ্য, সুসংগঠিত, চিন্তাশীল, আমানতরক্ষাকারী, শালীন, বিশ্বস্ত, বীর, উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, নেতা, প্রশাসক, সম্রাট এবং আহলুল্লাহ্-তে পরিণত করে জগতের শিক্ষক, বিজয়ী এবং সংস্কারক বানিয়ে দিলেন।

নজিরবিহীন বিজয়।

আঁ হযরত (সা.)-এর বিজয়ও ছিল বেনজির ও চিরস্থায়ী। নবুয়তের দাবির সময় গোটা শহর, জাতি এবং দেশ তাঁর বিরোধী ছিল। আর তাঁর ও তাঁর মান্যকারীদের উপর যে অন্যায় ও অত্যাচার করা হয়েছিল তা শুনে মানুষ আতঁকে ওঠে। কিন্তু মাত্র ২৩ বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব বিশ্ব তাঁর সামনে নিজেদের মস্তক নত করল। আর এই আরব-ভূমিতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন প্রতিমা বা উপাস্যের অস্তিত্ব থাকল না। বিরোধী ও তাদের সমর্থকরা সকলে উপাস্য হিসেবে পরাস্ত হল আর আঁ হযরত (সা.)এর চরণে এসে ধরা দিল। এটা হল অকস্মাৎ সফলতা।

আর স্থায়ী ও সুদুরপ্রসারী সাফল্য হল সমগ্র বিশ্বের প্রধান প্রধান সভ্যতাসমূহে অত্যন্ত স্বল্প সময়ে দ্রুততার সাথে ইসলাম প্রসার লাভ করে এবং ইসলামের শেকড় গভীরে প্রবেশ করে। এরপরের সাফল্য হল পৃথিবী থেকে শিরকের নাম মুছে যায়। বর্তমানে ধর্ম মান্যকারী সমস্ত জাতি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হওয়ার দাবি করে। এটি সেই লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ধ্বনির পরিণাম যা আজ থেকে ১৩০০ বছর পূর্বে আরবের মরুভূমি থেকে ধ্বনিত হয়েছিল। অধিকন্ত একেশ্বরবাদ ছাড়াও ইসলামের অপরাপর নীতি ও খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে যৌক্তিকভাবে উপযোগী মনে করে অন্যান্য জাতিরাও নিজেদের ধর্মে স্থান দিচ্ছে। যেমন, তালাক, খুলা, মদ ও মাদক দ্রব্য বর্জন করা, কাজ করার সময় পরামর্শ করা, সুদকে নিষিদ্ধ করা, পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক রাখা, উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টনের সময় মেয়েদেরকে অংশ দেওয়া, খাতনা (লিঙ্গচ্ছেদ) করানো, বিবাহ সম্পর্ক, খাওয়া দাওয়া এবং আয়-উপার্জনের মত বিষয়ে বৈধ ও অবৈধ নিরুপণ করা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এছাড়াও আঁ হযরত (সা.) এক অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করেছিলেন যা পৃথিবীর অন্য কোন মানুষ কোনদিন লাভ করে নি। সেটি হল এই যে, তাঁর উপর কোটি কোটি মানুষ ১৩০০ বছর দরে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে, পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল অংশে দরুদ প্রেরণ করে এবং তাঁর জন্য বিশেষ কৃপা ও কল্যাণের দোয়া প্রার্থনা করে। যদি দোয়ার কোনও মূল্য ও প্রভাব থাকে আর মানুসের মনোযোগের মধ্যে কোন শক্তি থাকে আর এই যমীন ও আসমানের কোন খোদা থেকে থাকেন যিনি দোয়া শোনেন এবং তা গ্রহণ করেন, তবে একথা নিশ্চিত যে, আঁ হযরত (সা.) এর সমতুল্য কোন ব্যক্তি নেই যে কি না এই কল্যাণ ও আশীর্বাদে ধন্য হয়েছে। তাঁকে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সব থেকে বেশী কৃপা ও কল্যাণের অধিকারী প্রমাণ করার জন্য একটি বিশেষত্বই যথেষ্ট ছিল, যদি অন্য কোন বিশেষত্ব না-ও থাকত। অতএব, যে ব্যক্তি বা জাতি বা ধর্ম দোয়ার শক্তিতে বিশ্বাসী, তাকে একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) পৃথিবীর একমাত্র ব্যক্তি যিনি খোদা তা'লার বিশেষ কৃপা ও কল্যাণ লাভ করেছেন। তাঁর তুলনায় কেউ তাঁর হাঁটুর যোগ্যতাও অর্জন করে নি।

সৃষ্টির প্রতি পরম স্নেহ এবং স্রষ্টার প্রতি পরম ভালবাসা

নিবন্ধ দীর্ঘায়িত হয়েছে। কেননা, গল্প যত মজার হবে ততই তা দীর্ঘ হয়। সৃষ্টির প্রতি আঁ হযরত (সা.) এর স্নেহ ও ভালবাসার সাক্ষী হল لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ । শুধু মানুষ নয়, পশুপক্ষী পর্যন্তও তাঁর অপার স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল না। সদ্যজাত সন্তানকে জীবিত সমাহিত করার প্রথা তিনিই বন্ধ করেছেন। তিনিই প্রথম মহিলা তথা মেয়েদের উত্তরাধিকারের অধিকার পাইয়ে দিয়েছেন। মৃতদেহকে বিকৃত করার কুপ্রথার বিলোপ সেই তিনিই ঘটিয়েছেন। ক্রীতদাস, ছোচ জাতি এবং মহিলাদেরকে, মোটকথা প্রত্যেক দুর্বলকে তুলে নিয়ে তিনিই তাদের উন্নতির পথে পরিচালিত করেছেন। এছাড়া রয়েছে কুফফারের সাক্ষী- মহম্মদ! তুমি তোমার প্রভুর ভালবাসায় উন্মাদ হয়ে গেছ।' এই সাক্ষী থেকে বোঝা যায় তিনি খোদাকে কতটা ভালবাসতেন। এমনকি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময়ও তিনি এই বাক্যই উচ্চারণ করেছিলেন- 'বির রাফিকিল্ আলা'।

জীবিত নবী

পরম সৌন্দর্য হল মনোহর যা ক্ষণস্থায়ী নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী হয়। আঁ হযরত (সা.) মূর্তিমান সৌন্দর্য ছিলেন, বরং মূর্তিমান অনুগ্রহও ছিলেন। তাঁর গুণাবলী কেবল তাঁর সত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এর সৌন্দর্য হল যে ব্যক্তি যত বেশি তাঁর আনুগত্য ও ভালবাসার তাঁকে গ্রহণ করে তত বেশি সেও ঐশী দরবারে গৃহীত হয়।

পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে আল্লাহ্ তা'লার রীতি এটাই দাঁড়িয়েছে যে তাঁর দরবারে প্রবেশের জন্য একথাই জিজ্ঞাসা করা হয় যে তুমি মহম্মদের উম্মত কি না। দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয় মহম্মদের সঙ্গে কতটা সাদৃশ্য তৈরী করেছ। এই দুটি প্রশ্নের সন্তুষ্টিব্যঞ্জক উত্তর পেলে তবেই খোদা তা'লার দরবারে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যায় এবং মর্যাদানুসারে স্থান পাওয়া যায়। অতীতের সমস্ত শরীয়তের পৃষ্ঠা গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে আর সমস্ত আম্বিয়ার মুদ্রা এখন অচল হয়ে পড়েছে। এখন কেবল একটিই শরিয়ত প্রচালিত আর একজন নবী জীবিত নবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। আর তিনি হলেন মহম্মদ (সা.)। প্রমাণের জন্য এ বিষয়টা প্রত্যক্ষ করাই যথেষ্ট যে, তাঁর আবির্ভাব থেকে আজ পর্যন্ত অন্য কোন নবীর কোন অনুসারী এমন দাবি করে নি যে, আমি আমার নবীর কল্যাণে খোদা তা'লার সঙ্গে বার্তালাপ এবং ইলহামের সম্মান লাভ করেছি। এই কল্যাণ তাঁর আগমণের পর কেবল উম্মতে মহম্মাদীয়ার সঙ্গেই বিশিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। যে জাতির মধ্যে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এমন অতীত হয়েছেন এবং বর্তমানেও রয়েছেন যারা দাবি করেন যে, তাদের জন্য আঁ হযরত (সা.) এর অনুবর্তিতার কল্যাণে খোদা তা'লার সঙ্গে বাক্যালাপের দ্বারা উন্মুক্ত হয় এবং খোদা তা'লার নৈকট্য ও মিলন লাভ হয়। অতএব, এইভাবেই আঁ হযরত (সা.) জীবিত নবী যে, তিনি মানুষকে খোদার সঙ্গে মিলিত করেন এবং বার্তালাপ করান আর তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য, তাঁর অনুকরণ, অনুগমণ এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা খোদা তা'লার নৈকট্যলাভের মাধ্যম। কেউ যত বেশি চারিত্রিক গুণাবলী, স্বভাব, ইবাদত, জ্ঞান ও ঐশী প্রেমে তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য তৈরী করে, খোদা তা'লার নিকট তার মর্যাদা তত উচ্চ হয়। এমন কি সে খোদা তা'লার সঙ্গে মিলনের চূড়ান্ত মর্যাদা অর্থাৎ ইহজগতে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে বার্তালাপের সম্মান লাভ করে।আর এটাই সেই শাফায়াত যা পৃথিবীতে মানুষের জন্য তাঁর কল্যাণে সূচিত হয়েছে আর আখেরাতে এটাই ব্যপকহারে প্রকাশিত হবে। এখন আর অন্য কোন নবীর অনুবর্তিতা কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন বানাতে পারে না। আর অন্য কোন শরিয়ত মেনে চলাও কাউকে কোন সম্মানের অধিকারী বানাতে পারে না। এখন এই মর্যাদা কেবল মহম্মদ (সা.) এর মাঝে বিলীন হয়ে লাভ হতে পারে। যার আগ্রহ ও প্রয়োজন রয়েছে সে উঠুক আর এই দরজা দিয়েই খোদার নৈকট্যভাজনদের দরবারে উপস্থিত হোক।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

আমরা নিজেরাই সাক্ষী আছি, এই জীবিত নবীর কল্যাণে বর্তমান যুগও বঞ্চিত হয় নি আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর আবির্ভাবের মাধ্যমে আঁ হযরত (সা.)-এর জ্যোতির বিচ্ছুরণ পূর্ণ মহিমা ও প্রতাপের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। 'ওয়াসসালাতো ওয়াসসালাম আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহি ও আসহাবিহি ও আলাল মসীহিল মাওউদ।

****

(৮ পাতার পর.....)

শরীফকে এমন আইনের মত করে পরিপূর্ণ করলেন যাতে দিওয়ানি ও ফৌজদারী ও অর্থনৈতিক সকল প্রকার নির্দেশনা বিদ্যমান ।অতএব আঁ হযরত (সাঃ) একজন সম্রাট হিসেবে সমস্ত দলের উপর ন্যায় বিচারক ছিলেন , এবং সমস্ত ধর্মের মানুষ তাদের মুকদ্দমা তিনি(সাঃ) এর নিকট সমাধানের জন্য নিয়ে আসত।কুরান শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে একবার একজন মুসলমান ও এক ইহুদির মুকদ্দমা আঁ হযরত(সাঃ)এর নিকটে উপস্থাপন করা হয়।তিনি(সাঃ)বিষয়টির অনুসন্ধান করার পর ইহুদি ব্যক্তিকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করেন। এবং মুসলমানের বিপক্ষে তার দাবীর ভিত্তিতে রায় দেন।" (এর উল্লেখ আমি পূর্বে করেছি।)" তাই কিছু নির্বোধ বিরুদ্ধবাদী যারা মনোযোগের সঙ্গে কুরান শরীফ অনুধাবন করেনা ,তারা প্রত্যেকটি বিষয়কে আঁ হযরত(সাঃ) এর নবুয়তের অধীনে নিয়ে আসে, অথচ এইধরণের শাস্তি খিলাফত অর্থাৎ সম্রাজ্যের অধিপতি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।"(অর্থাৎ এটা সরকারের দায়িত্ব)

" বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত মুসা (আঃ) এর পর নবী ও সম্রাট ভিন্ন ভিন্ন হত। যারা রাজনৈতিক বিষয়াদির মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখত।কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) এর সময় এই দুটিই দায়িত্বভার আঁ হযরত(সাঃ) কে প্রদান করা হয়েছিল । .....

এর থেকে স্পষ্ট যে যুদ্ধ কেবল অপরাধী প্রবৃত্তি পোষণকারীদের উদ্দেশ্যে ছিল , যারা মুসলমানদেরকে হত্যা করত অথবা সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করত ও চুরি ও দস্যুপনায় ব্যস্ত থাকত। তাছাড়া এই যুদ্ধগুলি সম্রাটের কাজ হিসেবে তিনি করেছিলেন।

অতএব যে পবিত্র নবী(সাঃ)র উপর এই বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল , এটা কিরূপে সম্ভব যে তিনি তাঁর উপর অবতীর্ণ হওয়া আদেশের বিষয়ে অন্যায় করবেন। তিনি(সাঃ) মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামে প্রবেশের এমন শর্ত ছাড়াই যে যদি ইসলামে প্রবেশ কর তবে নিরাপত্তা পাবে,সার্বজনিক ক্ষমা ঘোষণা করেন।এর এমন উদাহরণ আমরা দেখেছি। এর বিভিন্ন রূপ ছিল , কিন্তু এমন শর্ত ছিল না যে ইসলাম গ্রহণ করার শর্তেই ক্ষমা প্রদান করা হবে।বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার এবং প্রবেশ করার , কারো পতাকা তলে আশ্রয় নেওয়া , খানা কাবায় যাওয়া বা বিশেষ কারো গৃহে প্রবেশ করার কারণে ক্ষমা ঘোষণা করা হয় । আর এটি এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত যা আমরা আর কোথাও দেখতে পাইনা। সম্পূর্ণরূপে এই ঘোষণা করলেন যে , যাও আজকের দিনে তোমাদের জন্য কোনও শাস্তির অবকাশ নাই। তাঁর (সাঃ) উপর হাজার হাজার সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক যিনি নিজের এই মহান আদর্শ স্থাপন করে আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এই শিক্ষার উপর আমল করার শক্তি প্রদান করুন। আমীন।

(খুতবা, জুমা, ১০ই মার্চ, ২০০৬)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

কর্ম নির্ভরশীল উদ্দেশ্য তথা সংকল্পের উপর।

দোয়াপ্রার্থী: Ayesha Begum, Harhari, Murshidabad

আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী

(শান্তি প্রতিষ্ঠার আলোকে তাঁর শিক্ষা ও উত্তম আদর্শ)

মূল–মহম্মদ ইনাম গৌরী, নাযির আলা, কাদিয়ান

ভাষান্তর: মহম্মদ রফিকুল ইসলাম, এম.এ (বাংলা), বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান

يَّهۡدِیۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَیُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ بِاِذۡنِهٖ وَیَهۡدِیۡهِمۡ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ

ইসলামের অর্থ হল শান্তি এবং ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদস মহম্মদ মুস্তফা (সা.) সমগ্র বিশ্বের শান্তির দূত।

মনে রাখবেন প্রাথমিকভাবে আরাম, সুখ, শান্তি দুই প্রকারের হয়ে থাকে।

১) ব্যক্তিগত শান্তি ২) সমষ্টিগত শান্তি।

ব্যক্তিগত সুখ মান্তি মানুষের ব্যক্তিসত্তা, তার মন-মস্তিষ্ক, শরীর-স্বাস্থ্য, নিজ পরিবার, পরিবারের সদস্যগণ এবং নিজ দায়িত্ব অথবা নিজ পরিধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে।

সমষ্টিগত শান্তি হল, মানুষের সামাজিক জীবন ও অর্থাৎ নিজ পল্লী, শহর অথবা নিজ দেশ অথবা সর্বোপরি বিশ্বেস শান্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

সকল মানুষ চায় যে, সে সুখে শান্তি জীবন অতিবাহিত করুক, সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হোক, উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হোক, সুন্দরী স্ত্রী ও সুসন্তান থাকে,পরিবারের সদস্যগণ পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং নিকট ও দূরের আত্মীয়েরা সকলে ভালো থাকুক, নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া যেন না হয়।

সকল সামাজিক মানুষ সে শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিতি,ধনী অথবা গরীব, ফর্সা অথবা কালো, আরব অথবা অনারব, প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য এক কথায় সকলের ইচ্ছা হল, তারা যেন সুখ, শান্তি, বিলাসবহুল জীবন প্রাপ্ত হয়; অন্য ব্যক্তিকে কষ্টে নিপতিত করে হলেও। ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার্থে অন্যের ক্ষতি সাধন করতে চিন্তাও করা হয় না। দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন শান্তি অর্জন, দুঃখ-কষ্টের দূরীকরণ ও ক্ষতিপূরণের জন্য প্রথম ব্যক্তির ন্যায় কাজ করে তখন উভয় ব্যক্তির মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে যায়।

এভাবেই ব্যক্তিগত অশান্তি ব্যক্তি পরিধি হতে বের হয়ে নগর, নগর হতে শহর, শহর হতে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে ঘুরে ফিরে বৈশ্বিক অশান্তির কারণে পরিণত হয়।

এটি কোন কল্প কাহিনী নয়। আজ পৃথিবীর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে দিকপাত করুন, বৈশ্বিক অস্থিরতা ও অশান্তি দিনের আরাম ও রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এটি এমন এক অনস্বীকার্য সত্য যা সর্বজন স্বীকৃত এবং প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সোশাল মিডিয়ার সর্বত্রই এই একই আলোচনা চলছে।

এখন প্রশ্ন হল, ব্যক্তিগত, ব্যক্তিগত, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব? এর উত্তর হল, কেবল ঘোষণা ও নারা লাগিয়ে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব। ব্যবহারিরক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এই যাত্রা ঘর থেকে শুরু করে প্রতিবেশী, নগর, শহর, দেশ হতে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছাবে এবং পৌঁছাতে হবে।

আসুন এর প্রেক্ষাপটে মহানুভব হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)- এর জীবনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক এবং তাঁর শিক্ষা ও উত্তম আদর্শের কিছু উল্লেখ করা যাক।

গৃহের শান্তি

সর্বপ্রথম দেখা দরকার গৃহের শান্তি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। সেজন্য স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। একে অপরের আবেগ-অনুভূতিকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। নিজের আরামের থেকে নিজ সহচরীর আরামকে গুরুত্ব দিতে হবে। নতুবা প্রতিনিয়তঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদের কারণে গৃহের শান্তি ভঙ্গ হবে। সন্তানের শিক্ষার উপর খারাপ প্রভাব পড়বে। এখানে এর বিস্তারিত আলোচনার সময় নেই।

হযরত রসুলে করীম (সা.) এর শান্তিপূর্ণ সাংসারিক জীবন সম্পর্কিত কতিপয় হাদিস এখানে উপস্থাপন করছি।

তিরমিযির এক হাদীসে আঁ হযরত (সা.) বলেন-

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে সর্বোত্তম ব্যবহার করেন। আমি তোমাদের নিজ পরিবারের সঙ্গে সর্বাধিক উত্তম ব্যবহার করে থাকি। নিঃসন্দেহে প্রশিক্ষণ ও জাতির কল্যাণার্থে তাঁকে (সা.) একাধিক বিবাহ করতে হয়েছিল। একসময় তাঁর গৃহে নয়জন স্ত্রী বর্তমান ছিলেন। সকলেই তাঁর উত্তম আচরণ, ন্যায় বিচারে সন্তুষ্ট ও খুশি ছিলেন।

মুসলিম শরীফের এক হাদীস উপস্থাপন করছি,যেখানে ত্যাগকে দৃষ্টিপটে রেখে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উত্তম গুণাবলীকে অন্বেষণ করার উপদেশ প্রদান করে বলেন-

তোমাদের মধ্যে কারো চোখে যদি অন্যের দুর্বলতা ধরা পড়ে অথবা তার কোন ব্যবহার তোমার অপছন্দ হয় কিন্ত তার মধ্যে এমন কোন বিষয় তো রয়েছে যা তোমার ভাল লাগে তাকেই দৃষ্টিপটে রেখে ত্যাগকে প্রাধান্য দিয়ে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

কোন এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞাসা কনে, আঁ হযরত (সা.) বাড়িতে কি কাজ করতেন? তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, তিনিও অন্যান্য মানুষের ন্যায় একজন মানুষ ছিলেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন, ছাগলের দুধ দুইতেন এবং নিজের ব্যক্তিগত কাজ নিজেই করতেন। (মুসনাদ আহমদ)

রাতে দেরি করে বাড়ি ফিরলে কাউকে কোন প্রকার কষ্ট না দিয়ে ও না জাগিয়ে নিজের দুধ বা নিজেই খুলে যেতেন।

(মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সাক্ষ্য মজুদ রয়েছে যে, হযরত নবী করীম (সা.) ছিলেন সকল মানুষ হতে অধিক কোমল স্বভাব বিশিষ্ট, অধিক করুণাশীল এবং কোন লৌকিকতা ছাড়াই সাধারণ মানুষের ন্যায় বসবাস করতেন। তিনি (সা.) কখনো অহমিকা প্রকাশ করেননি; সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি আমার সারা জীবনে তাঁকে তাঁর কোন স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে দেখি নি এবং কোন সেবককে মারতে দেখি নি।

(তিরমিযি)

আমাদের প্রিয় সর্দার হযরত আকদস মহম্মদ (সা.) এর উত্তম ব্যবহারের এই উজ্জ্বল নিদর্শন তাঁর সাংসারিক জীবনকে চরম শান্তিময় ও জান্নাত সদৃশ বানিয়ে ছিল। সে কারণে তাঁর (সা.) সকল স্ত্রী তাঁর প্রতি সর্বদা খুশি ছিলেন।

اللھم صل علی محمد و ال محمد و بارک وسلم

নগরের শান্তি

ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে ডাইনে বামে সামনে পিছনে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। কুরআন করীমের তাকিদপূর্ণ হুকুম হল, নিজ পিতাপাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে। নিকট আত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশীদে সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করবে। সেই সঙ্গে যেখানে একত্রে কাজ করো সেখানেও একে অন্যের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে। (আন নিসা: ৩৭)

এই উপলক্ষ্যে কতিপয় হাদীস উপস্থাপন করছি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসুল করীম (সা.) এর নিকট আবেদন করেন, আমি কিভাবে বুঝব যে, আমি ঠিক করছি না ভুল করছি? আঁ হযরত (সা.) বলেন, তুমি যখন তোমার কোন প্রতিবেশীকে বলতে শুনবে যে,তুমি খুব ভাল, তখন জানবে যে , তুমি সঠিক কাজ করছ আর যখন তোমার প্রতিবেশী যখন বলবে, তুমি খুব বাজে,তখন জানবে তোমার ব্যবহার ভালো নয়। (ইবনে মাজাহ)

হযরত ইবনে উমর (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, জিব্রাইল আমাকে সর্বদা প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের জন্য এতটা তাকিদ করেন যে, এক সময় আমার মনে হয় তাদেরকে উত্তরাধিকারী না বানিয়ে দেন। (বুখারী)

হযরত আবু হুরাইয়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসুল করীম (সা.) বলেছেন, খোদা তা'লার কসম সেই ব্যক্তি মোমিন নয়, খোদা তা'লার কসম সেই ব্যক্তি মোমিন নয়, খোদা তা'লার কসম সেই ব্যক্তি মোমেন নয়, তিনি (সা.) তিন বার এই কথা বলেন) তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল,হে আল্লাহর রসুল (সা.) কোন ব্যক্তি মোমিন নয়? তিনি (সা.) বলেন, যার প্রতিবেশী তার উপদ্রব ও অতর্কিত আক্রমণ হতে সুরক্ষিত নয়। (বুখারী)

অতর্কিত আক্রমণ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে হতে পারে। যেমন, কখনও রাতের সময় উঁচু আওয়াজে চিভি রেডিও চালিয়ে প্রোগ্রাম শুনতে থাকা যার ফলে প্রতিবেশী শান্তিতে ঘুমাতে পারে না। কখনও ঘরের নোংরা আবর্জনা প্রতিবেশীর দরজার সামনে রেখে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

হযরত আবু যর (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেন, হে আবু যর! বাড়িতে যখনই কোন ভাল তরকারি রান্না করবে তাতে ঝোল বাড়িয়ে দেবে এবং নিজ প্রতিবেশীকে স্মরণ রাখবে। অর্থাৎ কোন না কোন প্রতিবেশীকে তরকারি দেবে। (মুসলিম)

নগরবাসীরা যখন সকলে নিজ প্রতিবেশীর এইভাবে খেয়াল রাখবে এবং সকল প্রকার-দুঃখ-যাতনা প্রদান করা হতে বিরত থাকবে, তখন নিঃসন্দেহে নগরে শান্তি বিরাজমান থাকবে।

সাধারণ শহরবাসীদের অধিকারের সঠিক জ্ঞান ও সেই অনুযায়ী অধিকার প্রদানে সচেষ্ট হলে সমগ্র শহরের শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এই সংক্রান্ত কতিপয় আদেশ-উপদেশ শ্রবণ করুন।

প্রথম, একে অপরের সঙ্গে যখনই সাক্ষাৎ হবে আস সালামু আলাইকুম বলুন। অর্থাৎ আপনার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের এখানে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী নমস্কার,সতশ্রী আকাল, গুড মর্নিং ইত্যাদি শব্দ সহযোগে একে অন্যকে সম্ভাষণ করে থাকেন। আবার নিজেদের মধ্যে করমর্দন করে থাকেন। এর ফলে পরিচিতি ও ভালবাসা বাড়ে এবং ঘৃণা ও তিক্ততা দূরীভূত হয়।

দ্বিতীয়, চলার পথে ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না। বরং পথ চলা মানুষের কষ্ট দায়ক বস্ত রাস্তা হতে দূর করার চেষ্টা করুন। আঁ হযরত (সা.) বলেন, রাস্তা হতে কষ্ট দায়ক বস্ত দূর করাও এক প্রকার সদকা।

তৃতীয়, পাবলিক প্লেসে উচ্চ আওয়াজে লড়াই ঝগড়া করা অনুচিত। এর ফলে সাধারণ মানুষের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে, যেখানে মহিলা ও শিশুরাও উপস্থিত থাকে, এই ধরণের ঘটনায় তারা খুব কষ্ট পায় এবং ঘাবড়ে যায়।

চতুর্থ, গোল হয়ে বা সমাবেশ তৈরী করে রাস্তার মাঝে দাঁড়ানো এড়িয়ে চলুন। রসুল করীম (সা.) বলেছেন, ' اِیَّاکُمۡ وَالۡجُلُوۡسَ عَلَی الطُّرُقَاتِ অর্থাৎ খবরদার! রাস্তার উপর বসবে না। সাহাবাগণ (রা.) বলেন, হে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এমন সমাবেশ ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই আমরা এখানে বসে কথা বলি,শলা-পরামর্শ করি। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা যদি বিরত না থাকতে পার তাহলে রাস্তার অধিকার আদায় কর। সাহাবাগণ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, রাস্তার অধিকার কি? তিনি (সা.) বলেন, দৃষ্টি অবনত রাখবে,কাউকে কষ্ট দিবে না, সালামের উত্তর দিবে, ভাল কাজের হুকুম দেবে এবং খারাপ কাজ হতে বিরত করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

পঞ্চম, অসুস্থদের পরিদর্শন করুন এবং তাদের উত্তম পরামর্শ ও উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করুন।

ষষ্ঠ, মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনে সহযোগিতা করুন এবং নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে সম্মানের সঙ্গে শেষ কৃত্য সম্পাদন করুন। এক ইহুদীর জানাযা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। নবী করীম (সা.) তা দেখে সসম্মানে দাঁড়িয়ে যান। সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এ তো এক অমুসলিম ইহুদির জানাযা। তিনি (সা.) বলেন, তার মধ্যে আত্মা ছিল না। অর্থাৎ মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষ একই রকম।

এরূপ বহু পথনির্দেশনা রয়েছে যা শহুরে মানুষদের আরাম পৌঁছাতে তাদের ও তাদের শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন। সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে আমি কয়েকটির উল্লেখ করলাম মাত্র। এই সম্পর্কে কতিপয় হাদিস উপস্থাপন করলাম।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, একে অপরের ক্ষতি করার জন্য দর বাড়াবে না, একে অপরকে ঘৃণা করবে না, একে অপর হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতার মনোভাব অবলম্বন করবে না। একজনের কেনা দ্রব্য মূল্যকে দর বাড়িয়ে ক্রয় করো না বরং আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। (মুসলিম)

হযরত বিন শোয়েব (রা.) পিতা ও পিতামহের বরাতে বর্ণনা করেন যে, রসুল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কনিষ্ঠের উপর কৃপা করে না এবং বড়কে সম্মান করে না তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

(তিরমিযি)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রসুল করীম (সা.) বলেছেন, সকল সৃষ্ট জীব আল্লাহ্‌র পরিবার। সুতরাং সৃষ্ট জীবের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রিয় যে আল্লাহ্‌র পরিবারের (সৃষ্টজীবের) সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করে। (মিশকাত)

রসুল করীম (সা.) একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন যে, তার কারণে কোনব্যক্তি অযথা কষ্ট পাবে না। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রসুল করীম (সা.) বলেন,

"সেই ব্যক্তি মুসলমান যার জিহ্বা ও হাত হতে অন্য মুসলমান সুরক্ষিত থাকে এবং মোমেন সেই ব্যক্তি যার থেকে মানুষের প্রাণ ও সম্পদ সুরক্ষিত থাকে।"

(তিরমিযি)

কেবল মানুষদের নয়, পশুদেরও কষ্টে নিপতিত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এক মহিলাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। সেই মহিলা বিড়ালকে আটকে রেখে, না খেতে দিয়ে বুভুক্ষ অবস্থায় মেরে ফেলেছিল। তাকে জল ও খাবার দেয় নি এবং ছেড়েও দেয় নি যে পৃথিবীতে বিচরণ ইঁদুর ইত্যাদি খেয়ে জীবন নির্বাহ করবে। এই অত্যাচারের কারণে তাকে জাহান্নামের আগুণে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। (মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদা রসুল করীম (সা.) এর সঙ্গে সফর করছিলাম। তিনি (সা.) কোন কারণে বাইরে যান।আমি খুমরাহ নামক এক পাখি দেখি যার সঙ্গে দুটি বাচ্চা ছিল। আমি সেই পক্ষী শাবক দুটিকে পাকড়া করি। ফলে খুমরাহ (পক্ষী শাবকের মা) মাথার উপর উড়তে থাকে। এমতাবস্থায় হুযুর (সা.) ফিরের আসেন এবং বলেন, কে সেই ব্যক্তি যে এই পাখিকে তার বাচ্চার কারণে কষ্টে নিপতিত করেছে? এর বাচ্চাকে ফেরত দাও। অতঃপর তিনি দেখেন কেউ একজন পিঁপড়ের গর্তে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তিনি(সা.) বলেন, আল্লাহ্ ব্যাতিরেকে অন্য কারোর জন্য সঙ্গত নয় যে, সে কোন প্রাণে আগুনে পুড়িয়ে মারবে। (আবু দাউদ)

আপাত দৃষ্টিতে একে অতি সাধারণ বিষয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবকে দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি আনার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক গুরুত্ব বহন করে।

সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এ পর্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। এখন ইসলামী শিক্ষার আলোকে সরকার ও রাষ্ট্রের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক বলে মনে হচ্ছে।

যে কোন সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হল, অবস্থানুযায়ী তাদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। মোটকথা, মানুষের মৌলিক চাহিদা নিবারণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন যে বিধান বর্ণনা করে তা হল,-

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۔
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُوا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ

(সূরা ত হা, আয়াত: ১১৯-১২০)

যদিও ক্ষুৎ-পিপাসা ও বস্ত্রের চাহিদাকে দৃষ্টিপটে রেখে মানুষেরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যের জন্য চেষ্টা করে থাকে,বিভিন্ন সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা মানব জাতির সাহায্যের জন্য চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হল প্রজাগণের স্থায়ী উপায় ও সম্পদের ব্যবহার করা যার মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে যে সরকার যতটা অবহেলা ও খারাপ ব্যবস্থাপনার কারণে ব্যর্থতা প্রদর্শন করবে প্রজাদের মধ্যে ততটা অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠা বিরাজমান হবে। অতঃপর বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সংঘটিত হবে।

এক্ষেত্রে এ কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, জনগণকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী নিজেদের পাঁয়ে দাঁড় করানো চেষ্টা করতে হবে এবং তাদেরকে দাবি ও চাওয়ার অভ্যাসকে পরিত্যাগ করাতে হবে। এ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) এর কতিপয় উপদেশাবলী এবং তাঁর (সা.) বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন করছি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসুল করীম (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত দায়িত্বাবলীর ন্যায় পরিশ্রম করে উপার্জন করাও এক দায়িত্ব ও কর্তব্য। (মিশকাত)

হযরত মিকদাদ বিন মা'দ ইয়াকরব (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেন, নিজের হাতে উপার্জিত রিযকের থেকে উত্তম রিযক আর অন্য কিছু নেই। (বুখারী)

যদিও আঁ হযরত (সা.) দাবি ও ভিক্ষাবৃত্তিকে পছন্দ করতেন না। তিনি (সা.) বলতেন উপরের হাত নিচের হাত (অর্থাৎ ভিক্ষুকের/গ্রহিতার হাত) উপক্ষো উত্তম। তথাপি কোন চাহিদা প্রার্থী তাঁর নিকট হতে খালি ফেরৎ যেত না। যদি কোন ব্যক্তির চাহিদা রদ করতেন তার পরিবর্তে উত্তম ব্যবস্থাপ প্রদান করতেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, একজন আনাসার তাঁর চাহিদা নিয়ে আঁ হযরত (সা.) এর নিকট উপস্থিত হন। তিনি (সা.) তাকে কিছু দেওয়ার পরিবর্তে জিজ্ঞাসা করেনন, তোমার বাড়িতে কি কিছু আছে? সে উত্তর দেয়, একটি চাদর, একটি চাদর এবং একটি পানির মশক আছে। তিনি (সা.) বলেন, সেগুলি নিয়ে এসো। সে উক্ত জিনিস দু'টি নিয়ে উপস্থিত হয়। রসুল করীম (সা.) সেই জিনিস দু'টি সাহাবাদের মধ্যে নিলামী করান। একজন বলেন, আমি এক দিরহামের বিনিময়ে এই দু'টি বস্তুকে ক্রয় করতে চাই। অন্য একজন বলেন, আমি দুই দিরহামের এই দু'টিকে ক্রয় করতে চাই। হুযুর (সা.) দুই দিরহামে উক্ত দুটি বস্তুকে বিক্রয় করে সেই আনসার ব্যক্তিকে বলেন, এই নাও এক দিরহামে খাবার জিনিস ক্রয় করে বাড়িতে দিয়ে এসো এবং এক দিরহামে কুড়োল কিনে আমার কাছে নিয়ে এসো। সে কুড়োল কিনে আনলে হুযুর (সা.) নিজেই উক্ত কুড়োলে কাঠের বাঁট লাগিয়ে তাকে দিয়ে বললেন, এই নাও এই কুড়োল নিয়ে কাঠ কেটে বিক্রি কর। পনেরো দিন পর্যন্ত আমি তোমাকে দেখতে চাই না। যাইহোক উক্ত ব্যক্তি কাঠ কেটে বিক্রি করতে থাকে। সে যখন হুযুর (সা.)এর কাছে আসে তখন তার কাছে পনেরো দিরহাম ছিল। হুযুর (সা.) তাকে বলেন, দরজায় দরজায় চেয়ে বেড়ানোার থেকে নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়া অধিক উত্তম। (আবু দাউদ)

শ্রমিকের পারিশ্রমিক সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) এর উপদেশঃ

শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। (ইবনে মাজ)

সেই সঙ্গে তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি শ্রমিকের প্রাপ্য প্রদান করে না, কেয়ামতের দিন শ্রমিকের পক্ষ থেকে আমি তার সঙ্গে ঝগড়া করব।

এ হতে বোঝা যাচ্ছে যে, যদি কোন মালিক শ্রমিকের পারিশ্রমিক দান না করে এমতাবস্থায় উক্ত শ্রমিকের প্রাপ্য প্রদানে সাহায্য করার সরকারের অন্যতম দায়িত্ব।

সুধী শ্রোতামণ্ডলী! সরকারের আরেকটি মৌলিক দায়িত্ব হল, প্রজাগণের সঙ্গে নিরপেক্ষ ব্যবহার ও সকল প্রকার অন্যায় ও অত্যাচার দূরীকরণের প্রচেষ্টা করা।

আজকের যুগে ন্যায় বিচারের লোপই হল সকল অশান্তি ও উদ্বেগের কারণ এবং বিশ্বব্যাপী অস্থিরতার কারণ। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ক্রমাগত বিশ্বের উচ্চ পদস্থ মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছেন। সেহেতু তিনি (আই.) ক্যাপিটাল হিল, ওয়াশিংটন ডিসি'তে ২০১২ সনে এক বক্তব্য প্রদান করে বলেন, "পবিত্র কুরআন করীম স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে যে, মানুষ হিসাবে তোমরা সকলে সমান। আঁ হযরত (সা.) তাঁর শেষ খোতবাতে সকল মুসলমানদের আদেশ দিয়েছিলেন যে, সর্বদা মনে রাখবেন, কোন আরবের অনারবের উপর প্রাধান্য নেই আর না বা কোন অনারবের আরবের উপর প্রাধান্য আছে। তিনি (সা.) শিখিয়েছেন যে, শ্বেত কৃষ্ণের উপর এবং কৃষ্ণ শ্বেতের উপর কোন প্রাধান্য নেই। সুতরাং ইসলামের এই অনন্য সুন্দর শিক্ষা যে, সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষ সমান। তিনি (সা.) স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, বৈষম্য ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান অধিকার দিতে হবে। এটি হল মৌলিক ও সুবর্ণ নীতি যার উপর আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক:

দেশীয় ও জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের পর এখন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতি যখন প্রত্যেক বড় শক্তি ছোট শক্তিকে দমন করে চলেছে এবং বিভিন্ন অজুহাতে ছোট শক্তিকে পরাভূত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যদি এই সকল প্রকার লড়াই-ঝগড়ার প্রকৃত কারণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তাহলে যে বড় কারণ সামনে উপস্থিত হবে তা হল, এক দেশের উপর অপর দেশের লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ অথবা অন্যের হতে অবৈধ লাভ উঠানোর ইচ্ছা অথবা তাকে পরাভূত করে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই স্বার্থপরতাকে শেষ করার জন্য ইসলাম কুরআন করীমের সূরা ত হা এর ১৩২ নং আয়াতে আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, 'তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত করে সেই অস্থায়ী সম্পদের (অর্থাৎ জাগতিক বিষয়াদির) প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর না যা আমি তোমাদের মধ্যে কিছু জাতিকে জাগতিক জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ প্রদান করেছি, যাতে আমি

তাদের কর্মকাণ্ডের পরীক্ষা নিতে পারি এবং স্মরণ রেখো, তোমার প্রভু তোমাকে যা প্রদান করেছেন তা তোমার জন্য উত্তম ও অধিকক্ষণ স্থায়ী।

এবং দ্বিতীয় মৌলিক আদেশ সূরা মায়েদা আয়াত নং ৯ এ প্রদান করেছেন।

হে যারা ঈমান আনয়ন করেছ! কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এই অপরাধ করতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, এটি তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা যে কাজ কর্ম করছ সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

আজ পর্যবেক্ষণ করুন পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সকল শক্তি পরস্পরের সহায় সম্পত্তির উপর লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়ছে এবং অন্যকে বেদখল ও পরাভূত করে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিজ নিজ উদ্দেশ্য পূরণে ব্যস্ত। এর ফলে অন্য জাতি ও দেশ যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হোক বা সেই দেশে ও জাতি যে প্রকার ধ্বংস হোক না কেন তার প্রতি কারোর মাথাব্যাথা নেই।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.) আজ হতে বহু বছর পূর্বে বলেছিলেন-

"বর্তমানে রাজনীতি দূর্নীতিতে পরিণত হয়েছে। ন্যায় বিচার ও খোদা ভীতি হতে বহু যোজন দূরে অবস্থান করছে। ইসলামের নামে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকারক মুসলিম রাষ্ট্রগুলির হৃদ্যতা আজ ইসলামি নৈতিকতা এবং ইসলামের ন্যায়বিচারের পরম নীতি হতে বর্জিত। বরং স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণে ব্যস্ত.. (অন্য দিকে) অন্যান্য জাতিরা ন্যায় বিচারের নামে বড় বড় দাবি করছে যেন পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে এবং তাদের ছাড়া ও তাদের ক্ষমতা ছাড়া ধরাপৃষ্ঠ হতে ন্যায় মুছে যাবে। কিন্তু আপনি যখন বিশদ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন তখন কুরআনে বর্ণিত সেই ন্যায় পরায়ণতার অভাব সর্বত্রই লক্ষ্য করবেন।"

(খলিজ কা বুহরান, পৃ: ১৪)

ধর্মীয় সম্পর্ক:

শান্তির ব্যাপারে ধর্মীয় সম্পর্ক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ধর্মীয় সম্পর্ককে সঠিকভাবে না জানা এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠার আসল শিক্ষাকে পিছনে ফেলে রেখে তথাকথিত ধর্মগুরুর ব্যক্তিগত চিন্তাধারার অন্ধ অনুকরণের ফলে বিভিন্ন ধর্ম অনুসারীদের মাঝে ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে। এভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহনশীলতার অভাব মানুষের শান্তি ও স্বস্তিকে এমন নষ্ট করছে যে, মানুষজন ধর্ম হতে বিরূপ ও দূরে সরে যাচ্ছে এবং যারা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত তাদের মধ্যে অধিকাংশ বাহ্যিকভাবে সংযুক্ত, তাদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা ও রীতিনীতি সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই।

এই সম্পর্কে ইসলামের শান্তিপ্রিয় শিক্ষা এবং আঁ হযরত (সা.) এর উত্তম চরিত্র এক উজ্জ্বল নিদর্শন যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এখানে সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

কুরআন করীমের শিক্ষা হল, আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতিপালকে; কেবল মুসলমানদের প্রতিপালক নয়। এর স্বপক্ষে প্রমাণ হল, আল্লাহ্ সকল জাতির মাঝে নবী ও পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। সে কারণে কোন ধর্মের প্রকৃত অবস্থাকে যতটা পরিবর্তন করা হোক না কেন সম্পূর্ণভাবে সেই ধর্মকে বিধ্বস্ত করা সম্ভব নয়।

অতঃপর নিজ ধর্ম ও মতের প্রচার প্রসারের জন্য কোন প্রকার বলপ্রয়োগ অথবা যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট আদেশ হল لَاۤ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ । অর্থাৎ ধর্মে কোন প্রকার বল প্রয়োগ বৈধ নয়। সুতরাং এটি স্পষ্ট ভ্রান্ত অভিযোগ যে, ইসলাম তরবারি চালানোর অনুমোদন প্রদান করে। ইসলামের যুদ্ধ কেবল আত্মরক্ষার যুদ্ধ ছিল অথবা নৈরাজ দূরীকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হয়েছিল।

আল্লাহ্ তা'লা এই অভিযোগকে কার্যতঃ দূর করার জন্য এই যুগে আঁ হযরত (সা.) এর প্রকৃত প্রেমিক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ (আ.) কে তরবারি ছাড়াই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন যাতে তাঁর মাধ্যমে ও তাঁর খলীফাগণ ও আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলাম প্রসারিত করে প্রমাণ করবেন যে, ইসলাম স্বীয় শান্তি প্রিয় শিক্ষার মাধ্যমে প্রসারিত হতে পারে তার জন্য কোন তরবারি ও যুদ্ধের প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) এক সমগ্র বিশ্বের নবী ও রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। মর্যাদার দিক হতে খাতামান নবীঈন রূপে আগমণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর উম্মত তাঁকে অন্য নবী হতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে শান্তি বাতাবরণ বিনষ্ট করুক তা তিনি সহ্য করতেন না। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা এক ইহুদি বাজারে জিনিস বিক্রি করছিল। এক মুসলমান কোন বস্তুর দ্রব্যমূল্য কম বলাতে উক্ত ইহুদী অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, সেই সত্তার সকম যিনি মূসাকে সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান রাগান্বিত হয়ে উক্ত ইহুদীকে চপেটাঘাত করে। উক্ত ইহুদী রসুল করীম (সা.) এর নিকট হাজির হলে আবেদন করে, আমি আপনার তত্ত্বাবধানে রয়েছি এবং এই মুসলমান আমাকে চপেটাঘাত করে অন্যায় করেছে। নবী করীম (সা.) সেই মুসলমানের উপর চরম রাগান্বিত হন এবং বলেন, আমাকে নবীগণের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে না। (বুখারী)

যাইহোক, এটি স্পষ্ট ও অবিসংবাদি বিষয় যে, যতক্ষণ ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে মানব জাতির মাঝে অফুরন্ত সহিষ্ণুতা ও সহ্য শক্তি না হবে, যতক্ষণ অন্যকে কষ্ট থেকে বাঁচানো অথবা আরাম প্রদানের আবেগ সৃষ্টি না হবে, যতক্ষণ অন্যের উপকারের জন্য ব্যক্তিস্বার্থ পরিত্যাগ করে এবং ত্যাগের নমুনা প্রদর্শন করার অনুভূতি সৃষ্টি না হবে, সব থেকে বড় জিনিস যতক্ষণ ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে কাজ না করা হবে ততক্ষণ গৃহের শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না আর নাই বা আন্তজাতিক স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। এজন্য আজ নয় তো কাল, নয়তো পরশু বিশ্বকে অবশ্যই ইসলামের শান্তিময় শিক্ষা ও মানব হিতৈষী, বিশ্বজগতের রহমত হযরত আকদস মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র উপদেশ ও উত্তম আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। এতদ্ব্যতিরেকে বিশ্ব, শান্তির মুখ পরিদর্শনে সক্ষম হবে না।

আমাদের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিশ্বের নাম করা সংসদভবন ও রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে এই বার্তা প্রেরণ করছেন এবং সার্বজনীন ধ্বংসের বিরুদ্ধে সতর্ক করছেন যা কেবল দরজার সামনে দাঁড়িয়েই নেই বরং সকল দেশ ও জাতির মাঝে প্রবেশ করেছে। কয়েক মাস পূর্বে জামাত আহমদীয়া জার্মানীর বার্ষিক জলসার অন্তিম ভাষণে হুযুর আনোয়ার বলেন,

'আমরা দেখছি ও অনুভব করছি যে, শান্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শান্তির কথা হয়,সকলেই বলে শান্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, গৃহের একমত্র সুখকর পরিকাঠামো হল শান্তি এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও শান্তি হল সুখকর পরিকাঠামো এবং সকলেই আশাবাদী যে, সকল স্তরেই শান্তি বিরাজমান থাকুক। কেবল আশা কিন্তু শান্তি প্রদান করে না। কেননা, এখানেও ব্যক্তি স্বার্থরক্ষার্থে শান্তি কামনা করা হয় আর পৃথিবীতে আমি এই জিনিসকে প্রত্যক্ষ করছি।"

"এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সর্বত্রই আমার দৃষ্টিগোচর হয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং লিডারদের মধ্যেও। রাজনেতাদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব,ক্ষমতা অধিকারের লড়াইয়ে পরস্পরের সঙ্গে যে অত্যাচার করা হচ্ছে এবং তা আমরা আমাদের দেশে সংঘটিত হতে দেখছি, একে অপরের উপর যে কর্মকাণ্ড সংঘটিত করছে তা এই চিন্তারই ফসল। সুতরাং তাদের যদি কেবল শান্তির আকাঙ্খা থেকে থাকে তা কেবল নৈরাজ্যের মধ্যে পূর্ণ হতে পারে। কেননা, এর মধ্যে আত্মকেন্দ্রীকতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা, যে সকল মানুষ শান্তি কামনা করে তাদের আকাঙ্খা কেবল এতটুকু যে কেবল তার এবং তার নিকটাত্মীয় অথবা তার জাতি সুখে শান্তিতে থাকুক। অন্যথায় অন্যান্য ব্যক্তি ও শত্রুপক্ষের শান্তি বিনষ্ট করাই তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। অতএব, এই রীতিকে যদি প্রচলিত করা হয় যে, নিজের জন্য এক নিয়ম এবং অন্যের জন্য পৃথক, তাহলে পৃথিবীতে যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে তা কেবল মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য শান্তি হবে; সমগ্র বিশ্বের জন্য নয়।..... আর যে শান্তি সমগ্র বিশ্বের জন্য নয় তাকে প্রকৃত শান্তি আখ্যা দেওয়া যাবে না। শান্তি তখনই প্রকৃত শান্তি বলে আখ্যায়িত হবে যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বংশ পরম্পরা,জাতিগত, দেশীয় স্বার্থের উর্দ্ধে গিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হবে, এক কেন্দ্র বিন্দুতে পৌঁছনোর চেষ্টা করতে হবে। এটি তখনই সম্ভব যখন মানুষ বুঝবে ও অনুধাবন করবে যে, আমার উপর এক উচ্চতর সত্তা রয়েছে যিনি কেবল আমার শান্তিকামী নন বরং সমগ্র বিশ্বের শান্তিকামী। তিনি কেবল আমার ঘর ও দেশের জন্য শান্তি আকাঙ্খী নন, বরং বিশ্বের সকল দেশের জন্য শান্তিকামী। সুতরাং আঁ হযরত (সা.) এর শান্তিময় শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুর অনুভূতি হল, এক উচ্চতর সত্তাকে দেখছেন, তাঁর জন্য আমার কথা ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। সর্বদা এই পন্থার অনুসরণ করতে হলে আঁ হযরত (সা.) বর্ণিত এই সুবর্ণ পন্থাকে সামনে রাখতে হবে যে, অন্যের জন্য তাই পছন্দ কর যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ করে থাক।

সুতরাং যদি নিজের ইহকাল ও পরকাল সঠিক করতে হয়, সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে হয়, তাহলে আঁ হযরত (সা.) এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহ্ তা'লার এই বাণীকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে- يَهۡدِىۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ । এই দীপ্তিমান পুস্তকের পথনির্দেশনা সর্বদা সামনে রাখুন। এই দীপ্তিমান পুস্তকের পথনির্দেশনা সর্বদা পড়তে হবে ও দৃষ্টিপটে রাখতে হবে তখনই শান্তিময় পথে পরিচালিত হতে পারবেন। এই পুস্তকের কোন আদেশ কখনোই মনুষ্য শান্তির বিনষ্টকারী নয়। সুতরাং আজ আপন-পর সকলের নিকট এই পয়গাম পৌঁছানো আমাদের কাজ এবং এটিই বিশ্ব শান্তির মূল নিগূঢ় তত্ত্ব।

বর্তমানে এই কাজ মসীহ মওউদ (আ.) এর জামাতের উপর ন্যস্ত হয়েছে আমরা যদি গৃহ স্তর হতে শুরু করে আন্তার্জাতিক স্তর পর্যন্ত এই অনুযায়ী নিজ ভূমিকা পালন না করি,তাহলে আমাদের সুখে শান্তিতে থাকার কোন জামানত নেই, আর নাই বা আমাদের উত্তরসূরীর সুখে শান্তিতে থাকার কোন জামানত রয়েছে এবং বিশ্বের সুখ শান্তির কোন জামানত নেই। বিশ্বকে অন্ধকার হতে আলোর দিশার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মাধ্যমে পরিণত করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সুচারুরূপে এই কর্তব্য পালনের তৌফিক দান করুন। "

(অন্তিম ভাষণ, জলসা সালানা জার্মানী, সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং)

****

হযরত আবু বাকার এবং হযরত মওলানা নূরুদ্দীন (রা.) এর পবিত্র জীবনী।

মূল- ফিরোয আহমদ নঈম, মুবাল্লিগ ইনচার্জ, দিল্লী

অনুবাদ: জাহিরুর হাসান, মুবাল্লিগ সিলসিলা, বাংলা ডেস্ক,কাদিয়ান

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

মুমিনদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে তাদের অঙ্গীকারে সত্যবাদী। তাদের মধ্যে কেউ তাদের মানত (চরম পর্যায়ে) সম্পন্ন করেছে এবং কেউ (এখনও) অপেক্ষা করছে; কিন্তু তারা (তাদের সংকল্প) সামান্যতম পরিবর্তন করে নি।

(আল আহযাব, আয়াত: ২৪)

সম্মানীয় জলসার সভাপতি এবং উপস্থিত অভ্যাগতগণ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।

আমার বক্তৃতার বিষয় হল হযরত আবু বাকার এবং হযরত মওলানা নূর উদ্দীন (রা.)-এর পবিত্র জীবন।

শ্রোতামণ্ডলী!

প্রতিটি যুগে যখনই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কোন প্রিয়ভাজনকে এ ধরাপৃষ্ঠে নিয়ে আসেন, তখন তাঁর সাহায ও সহযোগিত করতে আকাশীয় ও ভূপৃষ্ঠীয় নিদর্শনাবলীও সাথে প্রকাশ করতে থাকেন। আার তাঁকে তাঁর দর্পণ স্বরূপ ব্যক্তিত্ব দান করেন, যেমন প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.) কে হযরত আবু বাকার (রা.) এবং শেষ যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে নূর উদ্দীন (রা.) এর ন্যায় ব্যক্তিত্ব দান করেছিলেন।

আমি যথাক্রমে নবুওতের উপহার এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনীর উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব। নবীগণের পর বিশ্বে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.) যাকে মহানবী (সা.) প্রিয়তম বন্ধু বানাতে চেয়েছিলেন। যাকে সত্যের প্রেরণাদানকারী এবং সৎ ও সততার মূর্ত প্রতীক বলে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। অন্ধকার জাহেলিয়াতের যুগেও মদ, জুয়া এবং সর্বপ্রকার নেতিবাচক দিগুলি তিনি এড়িয়ে চলেছিলেন। যাঁর সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) বলেছিলেন, 'আমি তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অবধি কখনও পৌঁছতে পারব না। তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব যাঁকে মহানবী (সা.) মুসলমানদের নেতা নির্ধারণ করেছিলেন। যাঁকে জান্নাতের সকল দরজা থেকে প্রবেশের আহ্বান জানানো হবে। তিনি ইসলাম এবং মহানবী (সা.) কে এমন সাহায্য করেছেন যযে স্বয়ং মহানবী (সা.) বলেছেন যে, তাঁর অনুগ্রহের প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তা'লা দান করবেন।

শ্রোতামণ্ডলী! মহানবী (সা.) এর সভাকবি হাসান বিন সাবিত আনসারি (রা.) হযরত আবু বাকার সম্পর্কে বলেছেন,

'যখন তোমরা হৃদয়ে তোমার প্রিয় ভাই সম্পর্কে কোন ব্যাথাতুর স্মৃতি আলোড়ন ফেলে যায় তখন আবু বকরকেও তাঁর সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য স্মরণ করো। মহানবী (সা.) এর তিনিই সব চেয়ে বেশি খোদাভীরু এবং সর্বাপেক্ষা ন্যায়চেতা ও তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্বাবলীর বিষয়ে অঙ্গীকার রক্ষাকারী মানুষ ছিলেন। আর হ্যাঁ, সাউর গুহাতে মহানবী (সা.) এর সাথী যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন তিনিই আবু বাকার, যিনি তাঁর (সা.) এর প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি যে কাজেই হাত দিতেন সেটাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতেন। আর মহানবী (সা.) এর উপর প্রথম ঈমান আনয়নকারী তিনিই ছিলেন।

শ্রোতামণ্ডলী।!

এই মহা সত্যবাদী সিদ্দীক এ আকবর সেই প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন যাঁর মাধ্যমে খোদা তা'লা এ বিশ্বে নবী প্রেম, মহানবীর প্রতি আনুগত্যতা, গাম্ভীর্য এবং সহিষ্ণুতা, মার্জনা, গরীবদের প্রতি সহানুভুতি, অনুগ্রহ ও উত্তম আচরণের সুমহান দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর আরবী কবিতায় হযরত আবু বকর (রা.) প্রশংসায় বলেন-

"তিনি আল্লাহ্‌র রসূলের নিকট নিষ্কলুষ হৃদয়ে এসেছিলেন তাই তাকে জ্যোতির্ময় করে তোলা হয়েছিল। বেদনা সৃষ্টিকারী অমানিশার প্রভাবমুক্ত ছিলেন তিনি। তিনি আনুগত্যের উড়ান নিয়ে মহানবী (সা.) সহায়ক বাহু হয়ে উঠেছিলেন। আমরা জাগতিক ভোগবিলাসে নিমজ্জিত আর তিনি ছিলেন বধ্যভূমিতে হাশর দিবসের ন্যায় উপস্থিত। তিনি প্রকৃত অন্তঃকরণে খোদার খাতিরে মাতৃভূমির ভালবাসাকে জলাঞ্জলী দিয়েছিলেন এবং রসুল করীম (সা.)-এর সমীপে এক নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকের ন্যায় হাজির হয়েছিলেন।

(সিররুল খোলাফা: পৃ: ১৮২)

হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) এর প্রকৃত নাম আব্দুললাহ্ ছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল উসমান বিন আমর এবং পারিবারিক নাম (পদবী) ছিল আবু বকর। উপাধি ছিল আতিক এবং সিদ্দীক। তাঁর জন্ম হয়েছিল ৫৭৩ খৃষ্টাব্দে। মাতার নাম ছিল সালমা বিনতে সাহার বিন আমির এবং পারিবারিক পদবী ছিল উম্মুল খায়ের।

ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পেশা এবং স্থান সম্পর্কে তাবারীর ইতিহাসে লেখা আছে, আবু বকর তাঁর জাতির মধ্যে পছন্দনীয় এবং প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন নম্র স্বভাবের ব্যক্তিত্বের অধিকারী। পারিবারিক ইতিহাস এবং ভালমন্দ উভয়দিক সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বেশি অবগত। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী এবং উৎকর্ষতার মালিক ছিলেন। এসব অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বজাতির মানুষজন তাঁর কাছে আসত এবং তিনি তাঁর ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা এবং উত্তম সহাবস্থানের জন্য তাদের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

(তাবারীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৫৪০) তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অনেক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কয়েকটি তুলে ধরলাম।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) হযরত আবু বাকার (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'মহানবী (সা.) যখন নবুয়তের দাবি করেন সেসময় হযরত আবু বকর বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। ফিরে আসলে তাঁর এক সেবিকা তাঁকে বলে যে আপনার বন্ধু (নাউযু বিল্লাহ) প্রলাপ বকছেন, সে উন্মাদ হয়ে গেছে। সে বলে যে আকাশ থেকে তার উপর ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। হযরত আবু বকর তৎক্ষণাৎ ওঠেন এবং মহানবী (সা.) -এর সমীপে উপস্থিত হয়ে দরজায় কড়া নাড়েন। মহানবী (সা.) স্বয়ং বাইরে আসলে হযরত আব বকর তাঁকে বলেন যে, কোন ব্যাখ্যা না করে সরাসারি বলুন যে, একথা কি আপনি বলেছেন যে আপনার উপর ফেরেরশতা অবতীর্ণ হয় আর তারা আপনার সাথে বার্তালাপ করে থাকে। মহানবী (সা.) এই ভাবনায় যে হযরত আবু বকর যেন আঘাত না পান তাই তিনি বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে চাইলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে নিবৃত করে বললেন, আপনি শুধু এতটুকুই বলুন যে আমি যা যা শুনেছি তা সঠিক কি না? এর পর রসুলুল্লাহ্ (সা.) খানিকটা ভূমিকা নিয়ে কথাটা বলতে চাইছিলেন। কিন্তু এবার ও হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে নিবৃত করে বললেন, 'না, না! আপনি শুধু এতটুকুই বলুন যে, যা আমি শুনেছি তা সঠিক কি না? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, 'হ্যাঁ ঠিকই শুনেছ।; তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমি আপনার উপর ঈমান আনলাম। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আপনাকে প্রমাণাদি বর্ণনা করা থেকে শুধু এই কারণেই বিরত করেছিলাম যাতে আমার ঈমানের ভিত্তি দলিল প্রমাণাদি না হয়ে যেন শুধু পর্যবেক্ষণের উপর হয়। কেননা আপনাকে সত্যবাদী এবং পুণ্যবান মান্য করার পর আর কোন দলিল প্রমাণের প্রয়োজন থাকে না। মোটকথা, মক্কাবাসীরা যে কথা সংগোপনে রেখেছিল, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর আমলের মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন।"

(তফসীর কবীর ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫১-২৫২)

স্বয়ং মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি যাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি তাদের প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। ব্যতিক্রম একমাত্র আবুবকর (রা.), তাঁর সম্মুখে যখন আমি ইসলাম তুলে ধরি তিনি নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করেছিলেন।

(ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৭)

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর উপর অত্যাচার নিপীড়নের যুগ শুরু হয়ে যায় এবং বিভিন্নভাবে তাঁকে আক্রমণের নিশানায় পরিণত করা হয়। সঠিক পথের পথিকদের জন্য পরীক্ষা এবং বিপদাপদের সুন্নত অব্যাহত থাকে,সাহাবাদের মধ্যেও যা বজায় ছিল। তাঁদের উপর অত্যাচার নিপীড়নের মাত্রা এতটাই ছিল যে দানব পাহাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠত। কিন্তু এসব পবিত্রচেতা বীর সন্তানেরা নিজেদের প্রাণ, সম্পদরাজি অকাতরে খোদার পথে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। মক্কার কাফেররা ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর সর্বপ্রকার নির্যাতন করেছিল, তাদের আক্রমণের নিশানায় শুধু দুর্বল এবং ক্রীতদাস মুসলমানরাই ছিল না, স্বয়ং মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) ও মক্কাবাসী মোশরকদের নির্মম অত্যাচার থেকে নিরাপদে ছিলেন না। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে তাঁদেরকেও বিভিন্নভাবে উৎপীড়নের নিশানায় পরিণত করে তোলা হয়েছিল। একটি বর্ণনায় আছে যে একবার মূর্তিপূজারীরা মহানবী (সা.) কে বলে যে, তুমি কি আমাদের উপাস্য সম্পর্কে এসব কথা বল না? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ বলি। একথা শুনে তারা তাঁর চারপাশে জমা হতে শুরু করে। সেই সময় কেউ এসে হযরত আবু বকর (রা.) কে খবর দেয় যে, যাও,তোমার বন্ধুর খবর নাও। হযরত আবু বকর একথা শুনে বের হয়ে মসজিদ হারামে এসে পৌঁছন। তিনি দেখেনযে মোশরেকরা আল্লাহ্‌র রসুল (সা.) কে চার পাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমাদের অমঙ্গল হোক।

أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ

তোমরা কি একজন মানুষকে এ কারণে হত্যা কর কারণ সে বলে, 'আমার প্রভু আল্লাহ' এবং নিঃসন্দেহে সে তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছে।" একথা শুনে তারা মহানবী (সা.) কে ছেড়ে দিয়ে আবু বকরের দিকে এগিয়ে আসে এবং তাঁর উপর আক্রমণ করে বসে। হযরত আবু বকরের কন্যা হযরত আসমা বলেন, তিনি আমাদের কাছে এমন অবস্থায় ফিরে আসেন যে, তাঁর চুলে তিনি হাত দিতেন আর চুল তাঁর হাতের সাথে উঠে আসত। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(পবিত্রময় হে প্রতাপ ও মহা সম্মানের অধিকারী)

শ্রোতামণ্ডলী!

হযরত আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করে একনিষ্ঠ প্রেমিকের ন্যায় তবলীগ শুরু করেন। হযরত উসমান বিন আফফান, তালহা বিন আব্দুল্লাহ্, সাআদ বিন আবি ওয়াকাস, আব্দুর রহমান বিন অউফ সহ বহু সম্ভ্রান্ত সাহাবা (তাঁর তবলীগের মাধ্যমে) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত মিতব্যায়িতা এবং

খোদাভীরুতার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতকারী প্রত্যেকে প্রভাবিত না হয়ে পারত না। তাঁর জীবন মহানবী (সা.) এবং গরীব মুসলমানদের জন্য নিবেদিত ছিল। অনেক ক্রীতদাস এবং সেবাদাসী যাদের মালিক তাদের উপর নিদারুন অত্যাচার করত, তারা তাঁর অনুগ্রহের কারণে স্বাধীনতার স্নেহার্শিবাদ লাভ করেছিল। এসব গোলাদের মধ্যে হযরত বিলাল (রা.) এবং হযরত আমের বিন ফাহমেরা (রা)ও ছিলেন। খোদার সাথে তাঁর নৈকট্যের ঐকান্তিক বাসনায় তিনি তাঁর উঠোনে একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর ইবাদতের দৃশ্যায়ন এতটাই মনোমুগ্ধকর ছিল যে মানুষজন বিশেষ করে তাঁর ইবাদত দেখতে আসত আর প্রভাবিত না হয়ে পারত না। ঐশী নিদের্শনা قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অনুযায়ী তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার পথে ধনসম্পদরাজি খরচে এবং মিতব্যায়িতায় সকল সাহাবাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তিরমিযির একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একবার মহানবী (সা.) আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করার নির্দেশ দিলেন। তখন হযরত উমর বলেন, আজ আমি হযরত আবু বকর (রা.) এর থেকে এগিয়ে যাব। সেই মত তিনি তাঁর ঘরের অর্ধেক সম্পদ তুলে নিয়ে চলে আসেন। তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার পরিবারের জন্য কতটা সম্পদ অবশিষ্ট রেখে এসেছ? তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, হে রসুলুল্লাহ! অর্ধেক সম্পদ রেখে এসেছি। এরপর হযরত আবু বকর একটি পুটলি নিয়ে মহানবী (সা.) এর সকাশে হাজির হলে আল্লাহ্র রসুল (সা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবুবকর! পরিবার পরিজনের জন্য কি কি অবশিষ্ট রেখে এসেছ? একথা শুনে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে আমার পরিবারে রেখে এসেছি।

(মিশকাত, পৃ: ৫৫৪)

আর একটি বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) এক স্থানে বলেছেন, আবু বকরের সম্পদরাজি থেকে আমার যতটা উপকার হয়েছে এতটা আর কারোর সম্পদ থেকে হয় নি। তিনি বলেন, আমি পৃথিবীর প্রত্যেকের সকল অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়ে দিয়েছি। একমাত্র সিদ্দিক আকবরের অনুগ্রহরাজির প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা দেবেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

"মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে যে সিদ্দীক উপাধি প্রদান করেছিলেন, একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই উত্তম জানেন যে তাঁর মধ্যে কি কি গুণারাজি ছিল। মহানবী (সা.) একথাও বলেছেন যে, হযরত আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব এই কারণে যা তাঁর হৃদয়ে রয়েছে। আর যদি ভাল করে লক্ষ্য করা যায় তবে সত্যিই তিনি সততার এমন পরাকাষ্ঠা ছিলেন যার দৃষ্টান্ত পাওয়া অসম্ভব। আরর বাস্তব সত্য হল, প্রতিটা যুগে যারাই সততার আদর্শ স্থাপন করতে চায় , তাদের উচিত তারা যেন হযরত আবু বকর (রা.)এর চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট নিজেদের মধ্যে অর্জন করতে আপ্রাণ সচেষ্ট থাকে, আর সেই সাথে দোয়াও যেন করতে থাকে। যতক্ষণ না আবু বকর (রা.) স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের ছায়ার আঁচলে নিজেকে আবৃত না করবে এবং এই রং এ রঙীন না হয়ে উঠবে ততক্ষণ পর্যন্ত সি্দ্দীকি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সে হতে পারবে না।'

শ্রোতৃমণ্ডলী!

হযরত আবু বকর (রা.) এর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য মহানবী (সা.) এর সুন্নতের আদর্শে গঠিত ছিল আর তাঁর প্রতিটি আমল রসুল (সা.) এর অনুসরণ এবং অনুকরণের নান্দনিক প্রকাশক ছিল। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, 'আল্লাহ্র রসুল (সা.) একবার জিজ্ঞাসা করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযা রেখেছে?হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আজ আমি রোযা রেখেছি। অতঃপর মহানবী (সা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাযায় অংশগ্রহণ করেছে? হযরত আবু বকর (রা.) উত্তর দেন, 'আমি'। অতঃপর আল্লাহ্র রসুল পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে কে মিসকীনকে অন্নদান করেছে? আবু বকর (রা.) বলেন, 'আমি'। পুনরায় রসুলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কে কে অসুস্থকে সেবা করেছে? আবু বকর (রা.) বললেন,'আমি'। তখন মহানবী (সা.) বললেন, যার মধ্যে এতগুলি বৈশিষ্ট্য একত্রিত থাকবে, তিনি জান্নাতবাসী হবেন।"(মুসলিম, হাদীস নম্বর-১০২৮)

শ্রোতামণ্ডলী! মদিনা হিজরতের পুণ্যময় সফরে হযরত আবু বকর (রা.) যে বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন তার নজির কোথাও পাওয়া যায় না। দুটি উটনী হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পূর্বেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি উটনী তিনি কোন রকম প্রতিদান ছাড়াই মহানবী (সা.)এর সমীপে নিবেদন করেন। পাঁচ হাজার দিরহাম পাথেয়ও তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন। এছাড়া সাউর গুহাতে মহানবী (সা.) এর সঙ্গী হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেন। যার উল্লেখ কুরআন করীমে চিরকালের জন্য সংরক্ষিত আছে।

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

'দুজনের একজন, যখন তারা গুহায় ছিল এবং সে তার সঙ্গীকে বলল, দুঃখ করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।' (সূরা তওবা, আয়াত: ৪০)

হিজরতের যাত্রাকালে আরবদের এই অসহায় সৈনিক আল্লাহ্র রসুলের সুরক্ষার খাতিরেকখনও তাঁর (সা.) সম্মুখে চলছিলেন তো কখনও তাঁর পশ্চাতে। কখনও ডান দিকে তো কখনও আবার তাঁর বাম দিকে। এভাবে নিজের প্রাণপ্রিয়কে তিনি ইয়াসরাব পৌঁছে দিয়েছিলেন।

(সীরাতুল হালবিয়া, পৃ: ৪৫)

হিজরতের সেই সফরেরই একটি ঘটনা যখন হযরত আবু বকর (রা.) সুরাকাকে তাঁদের পিছনে আসতে দেখেন, তিনি কাঁদতে লাগেন। মহানবী (সা.) কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি আমার প্রাণ ভয়ে ভীত নই। আমি তো আপনার কথা ভেবে কাঁদছি যে, আমার প্রভুর যেন কিছু না হয়ে যায়।"

(মুসনাদ আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ২)

সাউর গুহাতে প্রবেশ করে হযরত আবু বকর (রা.) সমগ্র গুহাটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করেন এবং আশেপাশের ছিদ্রগুলি সব বন্ধ করে দেন যাতে সাপ বিছে জাতীয় কোন পোকামাকড় প্রবেশ করতে না পারে। একটি ছিদ্র অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল যেখানে তিনি তাঁর পা রেখে দেন। মহানবী (সা.) তাঁর উরুতে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় গর্ত থেকে একটি সাপ বের হয়ে তাঁর পায়ে ছোবল বসিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও ভালবাসার এই মূর্তপ্রতীক তাঁর ভালবাসার উপর এই বেদনাকে প্রাধান্য দিতে চায় নি। যন্ত্রণা এবং ভালবাসার এই সমন্বয়ে নীরবে তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে। প্রিয় রসুলের প্রতি ভালবাসার কি অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত! আল্লাহর রসুলের প্রতি এই অগাধ শ্রদ্ধা ও হৃদয়দৌর্বল্যই ছিল, যার আকর্ষণে মহানবী (সা.) এর বাঁধা পতাকার বাঁধন পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.) কখনও খুলতে চান নি।

শ্রোতামণ্ডলী!

পৃথিবীতে এমনও অনেক প্রেমিকের আগমণ হয়েছে যারা তাদের প্রেমাস্পদের জন্য অবলীলায় রাজ মুকুট অবধি পরিত্যাগ করেছে, আবার এমনও অনেকে ছিলেন যারা তাদের প্রিয়তমের করুণাদৃষ্টি লাভের জন্য তাদের দ্বারপ্রান্তে অবস্থাপন যাপন করেছেন। আবার এমনও শ্রেণী ছিল যারা ক্ষণকালের দর্শনলাভের পরমুহূর্তেই ফাঁসির যুপকাষ্ঠে নিজেদের সমর্পন করে দিয়ে গেছে। তাসত্ত্বেও অদম্য অবিচলতা,দৃঢ়তা এবং একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করে যাওয়া একমাত্র আবু বকর সি্দ্দিক (রা.) এরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যার কাছে পৃথিবীর সমস্ত আখ্যান ম্লান হয়ে যায়। আর তিনি তাঁর প্রেমের অভিব্যক্তি এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে কেয়ামত অবধি মহানবী (সা.) এর প্রতিটা নিষ্ঠাবান প্রেমিক নবী প্রেমে সি্দ্দীক এ আকবর (রা.) কে অনুসরন করতে থাকবে।

শ্রোতামণ্ডলী!

মহানবী (সা.) এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.) এর ভালবাসার উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

মক্কা থেকে মদিনয়া হিজরতকালেও আর মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের সময়েও হযরত আবু বকর (রা.) এর সম্পর্ক আল্লাহ্র রসুলের সাথে আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ ছিল। যখন মহানবী (সা.) এর উপর সূরা নসর অবতীর্ণ হয় , যার মধ্যে তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত গোপন সংবাদ ছিল, তখন মহানবী (সা.) সাহাবাদের বললেন, আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে তাঁর সান্নিধ্য লাভ অথবা জাগতিক উন্নতি- এই দুই এর মধ্যে কোন একটা বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, তখন আমি আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছি। উপস্থিত সকল সাহাবা এতে খুশি হলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর চিৎকার করে ওঠেন। তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। বলেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনার উপর আমার পিতা মাতা স্ত্রী সন্তান সব নিবেদিত হোক। আপনার জন্য আমি সব কিছু ত্যাগ করতে রাজি আছি। যেভাবে প্রিয় কারো কারোর অসুস্থতায় তার আরোগ্য কামনায় বকরা জবাই করা হয়ে থাকে একইভাবে হযরত আবু বকর (রা.)ও মহানবী (সা.)এর উদ্দেশ্যে নিজেকে এবং নিজের পরিবারের সকলকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর সহ সকল সাহাবা হযরত আবু বকর (রা.) এভাবে কান্না এবং কথা বলতে দেখে অবাক হয়ে যান। তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'আবু বকর আমার এতটাই প্রিয় যে যদি এ বিশ্বে খোদা ছাড়া অন্য কাউকে আন্তরিক বন্ধু বানানো জায়েজ হতো,তবে আমি আবু বকরকেই আমার প্রিয় বন্ধু বানাতাম। কিন্তু এখনও এ আমার বন্ধুই। অতঃপর বলেন, আমি নির্দেশ দিচ্ছি আজ থেকে মসজিদের মধ্যে খোলা প্রত্যেকের জানালা বন্ধ করে দেওয়া হোক। একমাত্র আবু বকর (রা.) জানালা ছাড়া।" এভাবে তিনি তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রা.) স্নেহবন্ধনের প্রশংসা করেছেন। কেননা এটি পরিপূর্ণ প্রেম ছিল, যা তাঁকে বলে দিয়েছিল যে এই বিজয় এবং সাহায্যের সংবাদের অন্তরালে মহানবী (সা.) এর মৃত্যু সংক্রান্ত সংবাদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আর সেই কারণেই তিনি নিজের এবং নিজের পরিজনের পক্ষ থেকে প্রাণের ফিদিয়া আল্লাহ্র সমীপে তুলে ধরেছিলেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে একবার হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমরে মধ্যে কোন বিষয়ে তর্ক বাধে। ঝগড়া আরো গভীর হওয়ার পূর্বেই হযরত আবু বকর (রা.) সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হন। তখন হযরত উমর (রা.) হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) কুর্তা টেনে ধরে বলেন যে আগে আমার কথার উত্তর দাও, এতে হযরত আবু বকরের কুর্তা ছিঁড়ে যায়। তখন হযরত উমর মহানবী (সা.) এর সকাশে গিয়ে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে নেন। এতে তিনি (সা.) বলেন, যে সময় সারা পৃথিবী আমাকে অস্বীকার করেছিল,তখন হযরত আবু বকর আমার উপর ঈমান নিয়ে আসে এবং আমাকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করে।" ঠিক তখনই হযরত আবু বকর (রা.)ও সেখানে উপস্থিত হন এবং মহানবী (সা.) এর অসন্তোষ দেখে নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করতে শুরু করেন। এটাই হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রেমানুরাগ ছিল যে মহানবী (সা.) এর কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেন নি।

শ্রোতামণ্ডলী! আবু বকর (রা. মহানবী (সা.) এর সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। কোন যুদ্ধে তিনি বিরত থাকেন নি। উহুদ যুদ্ধের দিন যখন সব লোক পালিয়ে গিয়েছিল তখন তিনি

মহানবী (সা.) এর পাশে অবিচল ছিলেন। এছাড়া তাবুক যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)এর উপর তিনি প্রাণপাত করে এসেছেন। আল্লাহ্‌র রসুলের উপর তাঁর এই সেবার এমন প্রভাব ছিল যে তিনি বলতেন, 'প্রাণ ও ধনসম্পদ দিয়ে আবু বকর (রা.)এর ন্যায় আমাকে কেউ অনুগ্রহ করে নি।"

যখন মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করেন তখন মানুষ হৃদয় বিদারক অবস্থায় আত্মহারা হয়ে বসে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.) এর মাধমে তাদের মধ্যে স্থিতাবস্থা নিয়ে আসেন। যে সময় তিনি একটি মহান অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ছত্রভঙ্গ জনতাকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলেন। যখন তিনি, ঐশী নিনাদে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর একজন রসুল ছিলেন এবং তাঁর পূর্বের সব রসুল গত হয়েছেন।

এই কণ্ঠস্বর শোনামাত্র এক এক করে সবার হৃদয়ে প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় আর হযরত উমর (রা.) এই আওয়াজ শুনে আর দাঁড়াতে পারেন নি। তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেখানেই বসে কাঁদতে শুরু করেন।

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর উদভ্রান্ত সমগ্র জাতিকে একত্রিত করার গুরুদায়িত্বও হযরত আবু বকর (রা.)এর উপর ন্যস্ত হয়। সমস্ত ধরণের বিবাদকে নিষ্পত্তি করে ভেঙ্গে পড়া জাতিকে পুনরায় তিনি উদ্ধার করেছিলেন।

(তারিখুল খোলাফা, পৃ: ৫১-৫২)

তাঁর খিলাফতকালে ইসলাম অনেক বড় বড় সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। পারস্য বিজয় হোক বা ইরান বিজয় কিংবা মুরতাদ বিদ্রোহীদের অসন্তোষ দমন, এছাড়া কুরআন করীমকে একত্রিত করার মত মহান কাজও তাঁর খেলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিল।

শ্রোতামণ্ডলী!

ভালবাসার এই মূর্তপ্রতীক নিজের সর্বস্ব আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল (সা.) এর খাতিরে উৎসর্গ করে আপন প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করেন। অতঃপর খেলাফতের সওয়া দুই বছর পর নশ্বর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে আপন প্রভুর সন্নিধানে চলে যান।

(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)

এখন আমি আমি আমার বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

শ্রোতামণ্ডলী! আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীরূপে আগমণ করেছেন। কুরআন করীমের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা যেমন প্রাথমিক যুগে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন করেছিলেন একইভাবে শেষ যুগেও তিনি স্বীয় নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। যেমনটা প্রথম যুগে মহানবী (সা.)আল্লাহর সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন আর আল্লাহ তাঁর দোয়া শুনেছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)- এর ন্যায় সাথী তাঁকে দান করেছিলেন। ঠিক একই রকমভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ)ও দোয়া করেছিলেন আর আপন মহাপ্রভুর কাছে সাহায্য কামনা করেছিলেন যে, হে আল্লাহ্! আমাকে কোন সাথী দান কর। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই আওয়াজ শুনেছিলেন এবং হযরত হেকিম মৌলবী নুর উদ্দীন (রা.)-এর ন্যায় মহান সাথী তাঁকে দান করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিকাশের প্রথম প্রকাশ- আহমদীয়াতের আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র- আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার আকর-জ্যোতির্ময়ী গুণাবলীর রত্নভাণ্ডার-কুরআন তত্ত্বজ্ঞানের প্রস্রবণ (মাহদীয়াত নামক প্রদীপটির এননিষ্ঠ পতঙ্গ)-সিদ্দীকি সৌন্দর্য রাজির বিকাশ-ফারুকী প্রতাপের দর্পণ হাজীউল হারামাঈন সৈয়্যদানা হাফিয হেকিম মৌলনা নূরুদ্দীন ভেরবী খলীফাতুল মসীহ প্রথম (রা.) ১৮৩৪ সালে ভেরা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হযরত হাফিয গোলাম রসুল এবং মাতার নাম নূর বখত। তাঁর বংশ পরিচয় ৩২ প্রজন্ম গিয়ে হযরত উমর ফারুক (রা.) এবং মাতার বংশ হযরত আলী (রা.)এর সঙ্গে মিলিত হয়। সেই দিক থেকে একাধারে তিনি ফারুকী আবার অন্য দিকে আলীয়ও।

শিশুকালে মায়ের কোলেই তিনি কুরআন পাঠ শিখেছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী একজন হাফিয ছিলেন। সাঁতারের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। শৈশব থেকেই বই পত্রের প্রতি অনুরাগ ছিল প্রবল। শিক্ষার্জনের জন্য তিনি লাহোর,রামপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী এবং ভোপাল ইত্যাদি স্থানে অবস্থান করেছিলেন। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি মদিনা অবধি গমণ করেছিলেন। শিক্ষালাবের সমাপ্তিতে তিনি মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন এবং ভেরাতে কুরআন মজীদ, আহাদীস ইত্যাদি পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করেন। সেই সাথে সেখানে চিকিৎসা কেন্দ্র শুরু করেন। যেখানে দূর দূর থেকে লোক তাঁর কাছে চিকিৎসা করানোর উদ্দেশ্যে আসত।

১৮৫৫ সালে হযরত মৌলবী সাহেব সর্ব প্রথম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর একটি ইশতেহার পাঠ করেন। এটি পাঠের পর এত সুগভীর প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে দর্শনের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান এসে পৌঁছন। সেখানে সাক্ষাতের পর তিনি হুযুর (আ.) এর প্রতি সমর্পিত তাঁর একনিষ্ঠ সেবকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। ১৮৮৯ সালে প্রথম বার যখন লুধিয়ানাতে বয়আত গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়, সেদিন সর্বপ্রথম বয়আতকারী হওয়ার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছিলেন। অতঃপর ১৮৯০ সালে যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবি করলেন, তখনও তিনি কোন রকম কাল বিলম্ব না করে হযরত আবু বকর (রা.) এর ন্যায় হুযুর এর দাবির প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

হযরত আকদস তাঁর গ্রন্থ 'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম' এ বলেন-

'আমি দিন-রাত আল্লাহর সমীপে কাতর নিবেদন করতাম যে, হে প্রভু আমাকে কে সাহায্য ও সমর্থন করবে? আমি একাকী। যখন সকাতর আমার দোয়ার হাত ওঠে এবং ঐশী পরিমণ্ডল আমার দোয়া দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়াকে গ্রহনীয়তার মর্যাদা দান করেন এবং এ মহা বিশ্বের মহাপ্রভুর করুণা তখন উদ্দীপ্ত হয়। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে একজন নিষ্ঠাবান সিদ্দীক দান করেন। তাঁর নাম তারই জ্যোতির্ময়ী গুণাবলীর ন্যায় নুর উদ্দীন।..... যখন সে আমার সাথে এসে মিলিত হল, আমি তাকে আমার প্রভুর নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে একটি নিদর্শনস্বরূপ পাই আর আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে এ হল আমার সেই দোয়ার ফল, যা আমি এতদিন সর্বদা করে এসেছি। আমার অন্তর্দৃষ্টি আমাকে বলে যে, সে আল্লাহ্ তা'লার নির্বাচিত বান্দাদের একজন। আর সে আমার প্রতি ভালবাসার আতিশয্যে নানা প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং কটূক্তির শিকার। প্রিয় স্বদেশভূমি এবং স্বজন-বন্ধু থেকে নিভৃতবাস যাপনকারী। আমার বাণী শোনার জন্য তার কাছে তার নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে যাওয়া খুবই সহজ। আমার আবাসভূমির প্রতি ভালবাসা তাকে তার নিজের দেশকে বিস্মৃত করে তুলেছে। প্রতিটি বিষয়ে সে আমার এমন আনুগত্য করে যেভাবে নাড়ীর স্পন্দন শ্বাসকে অনুসরণ করে চলে।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, পৃ: ৫৮১-৫৮২)

হযরত মসীঞ মওউদ (আ.) আল ওসীয়্যত পুস্তিকাতে মহানবী (সা.)–এর পর দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)এর খিলাফত উপস্থাপন করেছেন। এটা আশ্চর্য ব্যাপার যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পরবর্তীতেও আল্লাহ্ তা'লা যে ব্যক্তির হাতে মসীহ মওউদ (আ.) -এর সমস্ত সাহাবাকে একত্রিত করে দিয়েছিলেন তিনিও হযরত আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য রাখতেন। যেমন- হযরত আবু বকর পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি মহানবী (সা.) এর দাবীর পর কোনওরূপ দ্বিধা-দন্দ্ব না করে ঈমান এনেছিলেন। স্বয়ং মহানবী (সা.) বলেছেন।

انی قلت یاایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً فقلتم کذبت وقال ابوبکر صدقت

অর্থাৎ- আমি তোমাদের বললাম যে তোমাদের প্রতি আমি রসুল হয়ে অবতীর্ণ হয়েছি। তখন তোমরা বললে যে আমি মিথ্যা বলছি। একমাত্র আবু বকর আমার সত্যায়ন করে। যাকেই আমি ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি সে'ই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু আবু বকর (রা.)ই এমন যে কোনরকম সন্দেহ পোষণ না করে তাৎক্ষণিকভাবে ঈমান নিয়ে এসেছে।

একই প্রকারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হযরত আলহজ্জ আল হেকিম হযরত মৌলবী নূর উদ্দীন (রা.)-এর বিষয়ে বলেন-

"তিনি একম সময় কোন রকম ওযর আপত্তি না করে আমাকে গ্রহণ করেছিলেন, যখন চারপাশে কাফির হওয়ার ধ্বনি উচ্চতর হতে শুরু করেছিল, আর বয়আত করা সত্ত্বেও অনেকে বয়আতের অঙ্গীকারকে অস্বীকার করেছিল। তাদের অনেকেই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত এবং দোদূল্যমান অবস্থায় দিনাতিপাত করছিল। এমতবস্থায় সর্বপ্রথম মৌলবী সাহেবরই পত্র এই অধমের কাছে কাদিয়ানে আমার প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার সমর্থনে আসে, যার মধ্যে এই বাক্যটি লেখা ছিল-

اٰمَنَّا وَ صَدَّقْنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫২১)

আনুগত্য ও নিষ্ঠার এই অবস্থা ছিল যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল, মওলানা নুর উদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উদ্দেশ্যে লেখেন-

" হে আমাদের ইমাম, আমাদের পথপ্রদর্শক, আমাদের প্রভু!

আমার দোয়া এটিই যে আমি যেন সর্বদা আমার মনিবের সকাশে উপস্থিত থাকতে পারি। আর যুগের ইমাম, যাকে যে কারণে এ যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে মুজাদ্দিদ নিয়োজিত করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য লাভ করি। যদি অনুমতি হয় আমি আমার জীবিকা ত্যাগ করে দিন রাত আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকতে প্রস্তুত। আর যদি নির্দেশ হয় তবে সংসারের মোহ ত্যাগ করে পৃথিবীতে সত্য ধর্মের প্রচারে এবং এই পথে প্রাণ সমর্পণ করতে রাজি। আমি আপনার জন্য নিবেদিত প্রাণ। আমার সর্বস্ব যা কিছু আছে, তা আমার নয় বরং আপনার। হে আমার পীর! আমি আন্তরিক বিনয় নিয়ে নিবেদন করছি যে, আমার সব ধন-সম্প যদি ইসলাম ধর্মের প্রকাশানার কাচে ব্যয় হয় , তবে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। অতঃপর বলেন, বংশগত দিক থেকে আপনার সঙ্গে আমার ফারুকী সম্পর্ক বিদ্যমান। আমি আমার সর্বস্ব এই পথে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। দোয়া করবেন আমার মৃত্যু যেন সিদ্দিকীয়াতের মৃত্যু হয়।"

(ফতেই ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হযরত হেকিম নুর উদ্দীন (রা.)-এর উত্তম গুণাবলীর স্মৃতিচারণায় তাঁর পুস্তক 'ইযালায়ে আওহাম' - লেখেন-

'তাঁর ধন-সম্পদ আমাকে যতটা সাহায্য করেছে, তার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু আমি দেখি না। "

একইভাবে আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম' এর মধ্যে লিখেছেন-

"কোন ব্যক্তির সম্পদ আমার এত উপকার করেনি যতটা তার সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সে দিয়েছে এবং বহু বছর ধরে সে দিয়ে আসছে।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫৮২)

তাঁর সম্ভব গর্ব এবং মহানুভবতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাথে নিবিড় ঐশী সম্পর্কে উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি তাঁর সমস্ত উপার্জন ত্যাগ করে যা অন্যান্য শহরে তাঁর হতে পারত, কেন তিনি কাদিয়ানে থাকা বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন- তিনি নিজেই বলেছেন-

"এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হবে আমি যেখানে সেই সম্পদ পেয়েছি যা অমর। যা চোর-ডাকাত ছিনিয়ে নিতে পারে না। বিগত তেরো শত বছরে কোন উচ্চাকাঙ্খী

যা পায় নি তা আমি পেয়েছি। অতঃপর কি কারণে এমন অঢেল সম্পদ রেখে কয়েকদিনের জন্য পৃথিবী ঘুরে বেড়াব! আমি সত্য সত্যই বলি, কেউ যদি আমাকে প্রতিদিন এক লাখ বা এক কোটি টাকা দেয় এবং কাদিয়ানের বাইরে কোথাও রাখতে চায় তবুও আমি বাঁচতে পারব না। হ্যাঁ, ইমামের আদশে পালনে এক পয়সা না পেলেও। সুতরাং, আমার বন্ধু, আমার সম্পদ, আমার চাহিদা সব কিছুই এই ঈমামের অনুসরণের উপপর নির্ভরশীল এবং আমি এই একটি অস্তিত্বের জন্য আমার অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজ ত্যাগ করি।"

(সূরা জুমআর তফসীর, পৃ: ৬৩)

হযরত খলীফাতুল আওয়াল (রা.) জলসা সালানায় আগত অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে বলেন-

"আমাদের নিয়ে কিছু ভাববেন না। আমরা কি করেছি এবং আমাদের সত্তাই বা কি? আমরা যদি পরিণত হতাম তবে বাড়িতেই থাকতাম। নিষ্কলঙ্ক হয়ে থাকলে ইমামের কি দরকার? আমাদের তো অনেক বই ছিল। কিন্তু না, এসব দিয়ে কিছুই তৈরী হয় না। .... একইভাবে, যতক্ষণ আমরা এখানে (অর্থাৎ এই নশ্বর পৃথিবীতে) আছি ততক্ষণ আমরা আমাদের নিজস্ব রোগে ভুগছি। ..... আর এখানে চিকিৎসার জন্য বসে আছি। তাই আমাদের কোন কাজে রাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। একজন ধার্মিক ব্যক্তিই আছেন যিনি মসীহ ও মাহদী হিসেবে এসেছেন। তাই আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্‌র স্মরণে আসুন, যিনি অশ্লীলতা ও কুফর থেকে রক্ষা করে থাকেন। তাঁকে আপনার আদর্শ করুন এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করুন, যিনি একাধারে পথপ্রদর্শক, অনুসরণীয় এবং যুগের ইমাম।"

(সুরা জুমআর তফসীর, পৃ: ৬৩)

শ্রোতামণ্ডলী!

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাথে তাঁর সম্পর্কএবং বয়আতের ফলশ্রুতিতে হওয়া কল্যাণরাজির উল্লেখ একটি ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরছি। হযরত গুলাম রসুল রাজেকি সাহেব লেখেন, চৌধুরি নবাব খান সাহেব তহসীলদা নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন, সফরকালে যখন রাজেকীতে আসতেন তখন আমার কাছে অবস্থান করতেন। আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সত্যতা এবং তাঁর সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে গভীর আলোচনা করতাম। একদিন এইভাবে আমরা আমাদের আলোচনায় ডুবে ছিলাম তখন নবাব খান সাহেব আমাকে বলেন, একবার আমি হযরত হেকিম নূর উদ্দীন সাহেবকে নিবেদন করি যে, মওলানা, আপনি তো প্রথম থেকেই একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাহলে হযরত মির্যা সাহেবের বয়আত গ্রহণের পর আপনার কি উপকার হয়েছে? তখন হযরত হেকিম নূর উদ্দীন সাহেব বললেন, 'নবাব খান! মির্যা সাহেবের বয়আত গ্রহণে আমার প্রভূত উপকার হয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটা উপকার হয়েছে যে, ইতি পূর্বে স্বপ্নে মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর জিয়ারত হত, আর এখন জাগ্রত অবস্থায় আমি তাঁর দর্শন লাভ করে থাকি। অতঃপর বলেন, মির্যা সাহেবের সান্নিধ্যে থেকে এই উপকার পেয়েছি যে জাগতিক মোহ আমার শীতল হয়ে গেছে। এই সব কিছুই মির্যা সাহেবের পবিত্রকরণ শক্তি থেকে আমি লাভ করেছি।"

শ্রোতামণ্ডলী!

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) এর বিনয় সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে একজন সাহাবীর উদ্ধৃতি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন। এক সাহাবীর ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, একবার আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসি। তিনি মসজিদ মোবারকে উপবিষ্ট ছিলেন। সেখানে দরজার পাশে অনেকগুলি জুতো পড়ে ছিল। একজন সাদামাটা মলিন পোশাকের মানুষ এসে সেই জুতোগুলোর উপর বসে পড়ে। ঐ সাহাবী বলেন, আমি মনে করলাম কোন জুতো চোর হবে বোধহয়। এটা ভেবে আমি আমার জুতোগুলোর উপর নজর রাখা শুরু করি যাতে ঐ চোর জুতোগুলো নিয়ে পালিয়ে না যেতে পারে। তিনি বলেন, এর কিছুকাল পর যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর তিরোধান হয়, আর আমি শুনি যে, কেউ একজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে খলীফার আসনে বসেছেন, তখন আমি তাঁর হাতে বয়আত করার জন্য আসি। যখন আমি বয়আত করার জন্য হাত সামনে নিয়ে যাই, দেখি যে ইনি তো সেই ব্যক্তি যাকে আমার নির্বুদ্ধিতায় জুতো চোর মনে করেছিলাম। (অর্থাৎ হযরত খলীফা আওয়ালকে) । মনে মনে আমি খুবই অনুতপ্ত হই। তাঁর এটা অভ্যাস ছিল যে তিনি জুতোর উপর এসে বসে পড়তেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আওয়াজ দিলে তিনি কিঞ্চিত এগিয়ে এসে বসতেন মাত্র। এরপর যখন আবার বলতেন যে, 'মৌলবী নূর উদ্দীন সাহেব আসেন নি'। তখন আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেন। এরকম বার বার বলার পরই তিনি সামনে এসে বসতেন। ঐ সাহাবী বর্ণনা করেন যে, আমি তাঁর সন্তানদেরও বলতাম যে তিনি যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন, তা এই বিনয় প্রদর্শনের মাধ্যমে লাভ করেছেন।

শ্রোতামণ্ডলী! অন্যদের হৃদয়েও তাঁর জন্য প্রভূত সম্মান ছিল। মওলানা মহম্মদ আলী জহর, নবাব ওকারুল মূলক, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলবী জাফর আলী খান, আল্লামা শিবলী নুমানী, খাজা হাসান নিযামী সহ মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব তাঁর সুমহান মর্যাদা, প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের প্রতি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইসলামিক পত্র পত্রিকায় ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর মতাদর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হত।

(আলফযল, ২৭ শে মার্চ, ১৯৫৭, পৃ:৫, পর্যায় ১১/৪৬ নম্বর-৭৪)

স্যার সৈয়্যদ আহমদ খান প্রতিষ্ঠাতা আলিগর মুসলিম কলেজ তার এক পত্র ৮ই মার্চ ১৮৯৭ ইং এ হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর এক প্রশ্নের উত্তর এই শব্দবন্ধনে দিয়েছেন,

'অজ্ঞরা পাঠ লাভ করে যখন জ্ঞানার্জন করে তখন তাকে শিক্ষিত বলা হয়। কিন্তু সে যখন আরও উন্নতি সাধন করে তখন দার্শনিক হতে লাগে। এরপরও যখন উন্নতি করে তখন তাকে সুফি হতে হয়। আর যখন এরপর আরও উন্নতি সাধন করে তখন কি হয়?.......... এর উত্তর আমি স্বভাবজাত ভঙ্গীতেই নিবেদন করি যে, সুফি যখন উন্নতি সাধন করে তখন মওলানা নুরুদ্দীন- এ পরিণত হন।"

শ্রোতামণ্ডলী!

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আনুগত্য এবং তাঁর অনুশাসন মান্য করার বিষয়ে বলা হয় যে, তিনি (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলির উপর আমল করতেন। এর একটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে রাখছি,

"একবার তিনি তাঁর চিকিৎসাকেন্দ্রে বসে ছিলেন। চারপাশে লোকেরা ভিড় করে ছিল। একজন এসে বলল, মৌলবী সাহেব! আপনাকে হুযুর ডেকেছেন।এটা শোনামাত্র এমন ধড়ফড় করে ওঠেন যে পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে এবং জুতো পরতে পরতে এগোতে থাকেন। যেন হৃদয় আন্দোলিত এটা মনে করে যে হুযুরের আজ্ঞা পালনে বিলম্ব না হয়ে যায়। তারপর যখন তিনি খিলাফতের পদে আসীন হন, তখন তিনি প্রায়ই বলতেন যে আপনি কি জানেন এখানে নুর উদ্দীনের একজন প্রেমিক বাস করত যাকে মির্যা বলা হত। নূর উদ্দীন এমন আত্মভোলা হয়ে তাঁকে অনুসরণ করত যে জুতা-পাগড়ির কথাও তাঁর খেয়াল থাকত না।"

(হায়াতে নূর, পৃ: ১৮৭)

শ্রোতামণ্ডলী!

তিনি (আ.) তাঁর এক স্নেহধন্য শিষ্য মৌলবী নূর উদ্দীন (রা.) সম্পর্কে বলেন-

মৌলবী হেকিম নূর উদ্দীন সাহেবের আন্তরিকতা, ভালবাসা, নিঃস্বার্থতা, উদারতা এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে এক অদ্ভুত মহিমা রয়েছে। আমি অনেক প্রাচুর্যশালীকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে যৎসামান্য কিছু দান করতে দেখেছি। কিন্তু প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য নিজের মূল্যবান সম্পদরাজি বিসর্জন দিয়ে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণায় থাকা এবং নিজের জন্য দুনিয়ার কিছু না করার এই গুণটি মৌলবী সাহেবের মধ্যে কিংবা তাঁর সান্নিধ্যলাভকারীদের মধ্যে দেখা যায়। ....মহান আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মাহকে আরও বেশি বেশি এহেন চারিত্রিক গুণাবলীর মানুষ দান করুন। আমীন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

چہ خوش بودے اگر ہر یک ز اُمت نوردیں بودے

ہمیں بُودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے

অনুবাদ: কতই না ভাল হত যদি জাতির প্রতিটি সদস্য নুরুদ্দীন হয়ে যায়। কিন্তু তখনই হতে পারে যখন প্রতিটি হৃদয় ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

(নিশানে আসমানী, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪১০-৪১১)

যেমন এই উদ্দীপিত ঐশী অনুরাগ একতরফা ছিল না, বরং দুই বরকতময় অস্তিত্বই ছিল আল্লাহ্ এবং মহানবী (সা.) এর প্রতি ভালবাসায় নিবেদিত প্রাণ। দুজনেই ছিলেন একই গন্তব্যের অনুসন্ধানী। আর তারা উভয়েই হৃদয়ে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের বাসনায় গভীর রাতের প্রার্থনার মাধ্যমে একটি অলৌকিক ঘটনার অপেক্ষায় রত ছিলেন। এমন অবস্থায় বিনয়ের আচ্ছাদনে শোভিত একটি বীজ রূপে ১৮৮৯ সালের ২৩ শে মার্চ মসীহর অলৌকিক আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর করুণার মেঘমালা ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়ে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণ করে, এবং সুদীর্ঘকাল মসীহি আত্মার সান্নিধ্যে পরিপোষিত হয়ে ওঠার পর, ২৭ শে মে, ১৯০৮- এ দ্বিতীয় ঐশী বিকাশের প্রকাশ, একটি মহীরূহ আকারে আবির্ভূত হয়, যার প্রশস্ত শাখাপ্রশাখায় হাজার হাজার আত্মানুসন্ধানী পক্ষীকুল এসে প্রশান্তি লাভ করে। লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসী এই মহীরূহের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং তাদের আত্মা অমরত্ব লাভ করতে থাকে।

শ্রোতামণ্ডলী!

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হয়ে জামাততে উপদেশ প্রদান করে বলেন,

"পরিশেষে আমি আর একটি কথা বলতে চাই এবং একটি উপদেশ দিতে চাই যে আপনার সম্পর্ক যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহর রজ্জুর সাথে থাকে। কুরআন আপনার যেন পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে। আপনাদের একে অপরের সাথে কোন বিরোধ থাকা উচিত নয়, কারণ বিরোধ ঐশী বিধান পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই ক্রটির কারণেই মূসা (আ.) এর জাতি জঙ্গলে ধ্বংস হয়ে যায়। অপরদিকে আল্লাহর রসুল (সা.) এর মান্যকারীরা সতর্কতা অবলম্বন করেছিল, ফলে তারা সফলকাম হয়। এখন তৃতীয়বারে মতো আপনাদের পালা। অতএব, আপনার অবস্থা আপনার ইমামের হাতে গোসলের সময় মৃতদেহের ন্যায় হওয়া উচিত। আপনার ইচ্ছা ও আকাঙ্খাকে মৃত জ্ঞান করুন। নিজেকে ইমামের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত করুন যেভাবে গাড়ির সাথে ইঞ্জিন সংযুক্ত থাকে। অতঃপর প্রতিনিয়ত দেখুন আপনি অন্ধকার থেকে মুক্তি পান কি না।

প্রায়শই ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং দোয়ায় রত থাকুন। ঐক্য ত্যাগ করবেন না। অন্যের প্রতি সদয় হতে অবহেলা

এরপর শেষের পাতায়......

যুগ ইমামের বাণী

বর্তমান যুগে দ্বীনের খেদমত এবং আল্লাহ্ তা'লার বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে আধুনিক জ্ঞান অর্জন এবং যারপরনায় সাধনার প্রয়োজন। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

বিদায় হজ্জ এবং হযরত রসুল করীম (সা.) এর ভাষণ

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)

হিজরী নবম বর্ষে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় এলেন। সেদিন তাঁর উপর কুরআন করীমের যে প্রসিদ্ধ আয়াতটি নাযেল হয়, তা হল -'আল ইয়াওমু আকমালতু লাকুত দ্বীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়মাতি ওয়া রাজিতু লাকুম ইসলামা দ্বীনা'।

অর্থাৎ -আমি আজ তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম। এবং যে-সব আধ্যাত্মিক পুরস্কার খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাগণের জন্য অবতীর্ণ হতে পারে, তা সমস্ত তোমার উম্মতের জন্য দান করলাম। তাছাড়া এটাও ফয়সালা করে দেওয়া হল যে, তোমাদের ধর্ম শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যের উপর স্থাপিত'। (সূরা মায়েদা: ৪) এর আয়াত তিনি (সা.) মুজদালেফার ময়দানে হজ্জের উদ্দেশ্যে সমবেত লোকের সামনে উচ্চ:স্বরে পাঠ করে শোনান। মুজদালেফা থেকে ফেরার পরে হজ্জের রীতি অনুযায়ী তিনি মদিনাতে থামেন এবং ১১ই যিলহজ্জ তারিখে তিনি (সা.) সমবেত সমস্ত মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে তিনি (সা.) বলেন-

'হে লোক সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। কেননা, আমি জানি না যে , এই বৎসরের পর আর কখনও আমি এই ময়দানে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আর কোন বক্তৃতা দিতে পারব কি-না।

'আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জীবন ও তোমাদের সম্পদ একে অপরের আক্রমণ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত পবিত্র ও নিরাপদ করে দিয়েছেন।'

'আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তরাধিকারের অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এ ধরণের কোন ওসীয়্যত বৈধ হবে না, যা কোন বৈধ উত্তরাধিকারীর ক্ষতির কারণ হয়।'

'যার ঘরে যে সন্তান জন্ম নিবে, সে তারই সন্তান হবে। এবং কেউ যদি এই সন্তানের পিতৃত্বের দাবি করে, তা হলে সে শরীয়ত মোতাবেক প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করবে।'

'যে ব্যক্তি অন্য কাউকে নিজের পিতা বলে দাবী করবে,কিংবা কাউকে নিজের মালিক বলে মিথ্যা দাবী করবে, তার উপর খোদার এবং ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।'

'হে লোক সকল! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তেমনি তোমাদের উপরও তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার আছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে যে, তারা সতীত্ব বজায় রেখে জীবন যাপন করবে। এবং তারা এমন অশালীন কিছু করবে না, যাতে মানুষের সামনে তাদের স্বামীদের কোন সম্মানহানি ঘটে। এ জাতীয় কিছু যদি তারা করে, তাহলে তোমরা (কুরআন করীমের নির্দেশ অনুযায়ী তা যাচাই করবে এবং আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) তাদেরকে শাস্তি দিবে, কিন্তু তাতে কোন বাড়াবাড়ি করবে না। কিন্তু, যদি তারা এমন কিছু না করে, যা তাদের স্বামী ও বংশের অসম্মানের কারণ হয়, তাহলে তোমাদের কর্তব্য হবে, তোমাদের সাধ্যমত তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করা। মনে রাখবে যে, সর্বদাই নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। কেননা, খোদা তা'লা তাদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। নারীরা দুর্বল, তারা তাদের অধিকার নিজেরা রক্ষা করতে পারে না। কাজেই, তোমরা যখন তাদেরকে বিবাহ করো, তখন খোদা তা'লা তাদের অধিকার রক্ষার জন্য তোমাদের জামিন নিযুক্ত করে দেন। খোদা তা'লার আইন মোতাবকে তোমরা তাদেরকে তোমাদের ঘরে নিয়ে এস। অতএব, খোদা তা'লার অর্পিত সেই জামানতের কখনই খেয়ানত করবে না। এবং স্ত্রীদের অধিকার রক্ষার প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।'

'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের হাতে এখনও কিছু যুদ্ধ বন্দী রয়ে গেছে। আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা তাদেরকে তা-ই খাওয়াবে, যা তোমরা নিজেরা খাও। এবং তাদেরকে তা-ই পরতে দিবে যা তোমরা নিজেরা পর। যদি তারা এমন কোন অপরাধ করে ফেলে, যা তোমরা ক্ষমা করতে পার না, তাহলে তাদেরকে অন্যের কাছে দিয়ে দিবে। কেননা, তারা খোদারই বান্দা। তাই, কোন অবস্থাতেই তাদেরকে কোনরূপ কষ্ট দেওয়া বৈধ হবে না।

'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তা শোন এবং ভালভাবে মনে রেখো। 'প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। তোমরা সবাই সমান। সব মানুষ, তা তারা যে কোন জাতিরই হোক আর যে ধর্মেরই হোক, মানুষ হওয়ার কারণে, পরস্পর সমান। -(একথা বলার সময় তিনি (সা) তাঁর উভয় হাত উপরে তুললে এবং এক হাতের আঙ্গুলকে অপর হাতের আঙ্গুলগুলির সঙ্গে মিলালেন এবং বললেন) যেভাবে দুই হাতের আঙ্গুলগুলি পরস্পর সমান, সেভাবেই সকল মানুষ পরস্পর সমান।

'তোমাদের কোন অধিকার নেই যে, তোমরা একে অন্যের উপরে কোন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কর। তোমরা পরস্পর ভাই।'

তিনি (সা.) আবার বলেন, 'তোমরা কি জান, এখন কোন্ মাস? এই এলাকা কোন এলাকা? তোমাদের কি জানা আছে, আজকের দিনটি কোন্ দিন?'

লোকেরা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, এই মাস পবিত্র মাস। এই এলাকা পবিত্র এলাকা। আজকের দিন হজ্জের দিন।'

তাদের সকলেরই উত্তর শুনে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলতে থাকলেন, 'যেভাবে এই মাস পবিত্র মাস, যেভাবে এই এলাকা পবিত্র এলাকা, যেভাবে এই দিন পবিত্র দিন, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি মানুষের প্রাণ, সম্পদ ও সম্মান পবিত্র করে দিয়েছেন। এবং কারো প্রাণের উপর কিম্বা সম্পদ ও সম্মানের উপর আক্রমণ করা ঠিক যেমন অবৈধ, ঠিক তেমন এই মাসের এই এলাকায় এই দিনে অমর্যাদা করা অবৈধ। এই হুকুম শুধু আজকের জন্যই নয়, শুধু কালকের জন্য নয়, বরং সেই দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিনের জন্য, যেদিন তোমরা খোদার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে।'

তিনি (সা.) আরও বলেন, 'এই সমস্ত কথা, যা আমি আজ তোমাদেরকে বলছি, তা তোমরা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিও। কেননা, এমনও হতে পারে যে, যারা আজ আমার কথা আমার কাছ থেকে শুনেছ, তাদের চাইতে যারা আমার কাছ থেকে আমার এই কথা শুনছে না,তারা এই স কল কথার উপর বেশি আমল করবে, বেশি বেশি পালন করবে।'

এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ বলে দিচ্ছে যে, মানুষের মঙ্গ ও তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য রসুলে করীম (সা.) কত বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। এবং নারীজাতি ও দুর্বলের অধিকার রক্ষার প্রতি কত বেশি আন্তরিক ছিলেন। রসুলুল্লাহ (সা.) জানতেন, তাঁর ইহজীবনের দিন শেষ হয়ে আসছে। হয়তো বা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবনের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই, তিনি চান নি যে, যে নারীদেরকে মানব জন্মের আদি থেকেই পুরুষদের দাসী বানিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আদেশ-নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই তিনি জগত ছেড়ে চলে যান। তিনি চেয়েছিলেন, ঐ সকল যুদ্ধবন্দী, যাদেকে মানুষ ক্রীতদাস বলে আখ্যায়িত করে, এবং যাদের উপর নানা প্রকার অত্যাচার চালাতে থাকে, তদের অধিকার সুনিশ্চত করার পরই তিনি যেন দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। তিনি চান নি যে, মানুষে মানুষের যে প্রকাশ্য বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে, কাউকে পাতালে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তা ঘুচিয়ে দেওয়ার আগে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তিনি চান নি, যে সকল কারণে, জাতিতে, জাতিতে দেশে দেশে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি হয়, তা সর্ব-সাকুল্যে দূরীভূত করার আগে তিনি এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। একে অপরের অধিকার আত্মসাৎ করা বা অধিকার খর্ব করার সব সময়েই বর্বর যুগের এক অভিশাপ বলে গণ্য করা হয়। তার অশুভ বাসনাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না হত্যা করা হয়, ততক্ষণ তিনি পৃথিবী ছেড়ে যেতে চান নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের প্রাণ ও সম্পদকে সেই পবিত্রতা, সেই নিরাপত্তা দান না করা হয় যা খোদা তা'লার পবিত্র মাসগুলোকে খোদা তা'লার পবিত্র ও কল্যাণমণ্ডিত স্থানসমূহকে দান করা হয়েছে, ততক্ষণ তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চান নি।

নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা দান, সব জাতির জন্য নিরাপত্তা ও শান্তি স্থাপন, মানবজাতির মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য এত বেশি গভীর উদ্বেগ ও আন্তরিকতা পৃথিবীর আর কোন মানুষের মাছে কেউ কি কখনও দেখেছে? হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানবজাতির জন্য এত ভালবাসা, এত আকুলতা, এত সংকল্প আর কোন মানুষের মধ্যে কি কখনও দেখা গেছে? এসব কারণেই তো ইসলামের মধ্যে নারীরা তাদের সম্পত্তির মালিক। যে মালিকানা অর্জন করতে পেরেছে ইউরোপ ইসলামের তেরশ' বছর পরে। এই কারণেই তো ইসলাম গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য সবার সমান হয়ে যায়, তা সে যত ছোট এবং যত নীচু জাতের লোকই হোক না কেন।

স্বাধীনতা ও সাম্যের শিক্ষা ও আদর্শ কেবল ইসলাম, হ্যাঁ, কেবল ইসলামই কায়েম করেছে পৃথিবীতে। এবং এমনভাবে কায়েম করেছে যে, আজ পর্যন্ত দুনিয়ার আর কোন জাতি তা করতে পারে নি। আমাদের মসজিদে একজন সম্রাট কিংবা একজন সম্মানিত ধর্মীয় নেতাও একজন সাধারণ মানুষের সমান। সেখানে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য বা কোন ভেদাভেদ নেই। অথচ, অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়গুলোতে বড় ও ছোটর মধ্যে ভেদাভেদ আজ-অব্দি বজায় রয়েছে। যদিও সেই জাতিগুলি স্বাধিকার ও সাম্যের কথা মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশি জোর গলায় প্রচার করে চলেছে।

৩ মার্চ, ২০১৭ তারিখের জুমুআর খুতবায় 'বিবাহ সংক্রান্ত' বিষয়ে হুযূর (আই.) দিক নির্দেশনা

"মহানবী (স.)-এর এই কথা সবসময় স্মরণ রাখতে হবে, যাতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সময় অগ্রাধিকার প্রদান করার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যা রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'চারটি কারণে কোন মেয়েকে বিয়ে করা হয়: প্রথমত তার সম্পদের কারণে, দ্বিতীয়ত তার বংশের কারণে, তৃতীয়ত তার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং চতুর্থত তার ধার্মিকতার কারণে। অতএব তোমরা ধার্মিক মেয়ে নির্বাচন কর, আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করবেন।' এ কথা যদি ছেলেরাও এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাও সামনে রাখে, তাহলে মেয়েরা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা অবশ্যই ধর্মকেই প্রাধান্য দেবে। আর ধর্ম যদি অগ্রাধিকার পায় তাহলে অনেক অভিযোগ-অনুযোগ যা মেয়ে এবং ছেলে এবং তাদের পরিবার সম্পর্কে পরস্পরের মাথায় দানা বাঁধে, তা দূর হয়ে যাবে। আর যেই ছেলে ধার্মিক মেয়ের সন্ধানে থাকবে আর ধর্মকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে, তাকে নিজের আমল বা ব্যবহারিক আচার-আচরণও ধর্মীয় শিক্ষাসম্মত করতে হবে। আর যে ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণ করবে, তার ঘরে বিনা কারণে ছোট ছোট বিষয়ে ফিতনা এবং নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে না।"

২ পাতার পর.....

আসছিল, তিনিও এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। ওহোদে তাঁর এক ছেলে উমর বিন মোয়ায শহীদ হয়েছিলেন, তাঁকে দেখে সা'দ বিন মোয়ায বললেরন,'ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার মা, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার মা আসছেন।' তিনি (সা.) বললেন, 'অনেক বরকত ও আশিসের সঙ্গে আসছেন। বৃদ্ধা এগিয়ে এলেন এবং রসুলুল্লাহ্ সা.) কে দেখার জন্য তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন। শেষে রসুলুল্লাহ্ (সা.) চেহারার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল এবং তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'মা! তোমার ছেলে শহীদ হওয়াতে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। আমি আমার সববেদনা জানাচ্ছি।' এই কথা শুনে সেই পুণ্যবতী মহিলা বললেন, 'হুযুর! আমি যখন আপনাকে ভাল অবস্থায় দেখেছি, তক্ষুনি আমি আমার সব দুঃখ বেদনাকে ভেজে খেয়ে ফেলেছি।' কি সুন্দর বাচন-ভঙ্গী! ভালবাসার কি গভীর অনুভূতি! চিন্তা ভাবনাই তো মানুসকে খেয়ে ফেলে, অথচ তিনি কত উদ্দীপনার সঙ্গে বলছেন যে, ছেলের চিন্তা আমাকে কি খেয়ে ফেলবে? যতক্ষণ মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) বেঁচে আছেন, ততক্ষণ আমি আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে গিলে খাব। আমার ছেলের মৃত্যুর দুঃখ তো আমাকে মারতে পারবে না। বরং সে যে রসুল করীম (সা.)-এর জন্য প্রাণ দিতে পেরেছে, সে আমার শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে।' হে আনসার! আমার জীবন তোমাদের জন্য উৎসর্গিত হোক। কত না মহান পুরস্কার তোমরা পেয়ে গেছ।

(নবীয়োঁ কা সরদার, পৃ: ১০১-১০২)

সমস্ত মুহাজির ও আনসার আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকত। যে যখনই সুযোগ পেয়েছে হাসিমুখে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছে। কুরআন করীম যার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে এই ভাষায়- مِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ।

হযরত সাআদ বিন রাবি আনসারী (রা.) এর আত্মোৎসর্গের এর দৃষ্টান্ত দেখুন। মুহাজিরগণ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা এলেন এবং আঁ হযরত (সা.) প্রত্যেক মুহাজিরকে এক একজন আনসারের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করলেন, তখন আনসাররা তাদেরকে নিজেদের প্রকৃত ভাইদের থেকে বেশি ভালবেসেছেন এবং নিজেদের বিষয়-সম্পত্তির অর্ধাংশ তাদের হাতে সঁপে দেওয়ার জন্য পিড়াপিড়ী করেছেন। কিন্তু একজন আনসার সাহাবী এমনও ছিলেন যিনি তাঁর মুহাজির ভাই আব্দুর রহমান বিন অউফকে বলেন, 'আমি আমার এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি, ইদ্দত পূর্ণ হলে তুমি তার সঙ্গে নিকাহ করে নাও।' সেই সাহাবী ছিলেন সাআদ বিন রাবী আনসারী। যে ব্যক্তি নিজের পাতানো ভাইয়ের জন্য এমন আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে পারে, তাঁর আবেগ কি রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর জন্য কোন অসাধারণ মানের হবে! হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ (রা.) বলেন- ওহোদের যুদ্ধের সময় যুদ্ধ শেষে যখন শহীদদের দাফন এবং আহতদের উদ্ধারের কাজ চলছিল, তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন-

'আনসারদের সর্দার সাআদ বিন রাবীর কি অবস্থা, তিনি জীবিত না শহীদ তা কেউ গিয়ে খোঁজ নিক। কেননা, আমি যুদ্ধের সময় দেখেছিলাম বর্শাধারী শত্রু-সেনা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। তাঁর কথায় আবি বিন কাআব নামে এক আনসারী সাহাবী বের হয়ে যুদ্ধের ময়দানে ইতস্ততভাবে সাআদকে খুঁজতে থাকেন, কিন্তু তিনি কোন সন্ধান পান না। অবশেষে তিনি জোর গলায় সাআদের নাম ধরে তাঁকে ডাকতে শুরু করেন, কিন্তু তবু কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর মনে এই ভাবনার উদ্রেক হল যে আঁ হযরত (সা.)-এর নাম ধরে ডাকলে হয়তো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই ভেবে তিনি উচ্চ কণ্ঠে ডেকে বললেন, 'সাআদ বিন রাবী কোথায়? আমাকে রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। এই আওয়াজ পেয়ে সাআদ এর মৃতপ্রায় দেহে যেন বিদ্যুত তরঙ্গ খেলে গেল। তিনি চমকে উঠলেন, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন- 'কে বলছ আমি এখানে আছি।' আবি বিন কাআব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন, কিছুটা দূরে নিহতদের স্তুপে সাআদ এর খোঁজ পেলেন, যখন কি না তাঁর প্রাণ প্রায় যায় যায় অবস্থা। আবি বিন কাআব তাঁকে বললেন, ' আঁ হযরত (সা.) আমাকে আপনার অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ নিতে পাঠিয়েছেন।' সাআদ উত্তর দিলেন, 'রসুলুল্লাহকে আমার সালাম নিবেদন করবে আর বলবে- খোদার রসুলগণ তাঁদের অনুসারীদের আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার কারণে যে যে পুণ্য লাভ করে থাকেন, খোদা তা'লা আপনাকে সেই পুণ্য সকল নবীদের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে দান করুন আর আপনার নয়নের স্নিগ্ধতা দান করুন। আর আমার মুসলমান ভাইয়েদের কাছেও আমার সালাম পৌঁছে দিও আর আমার জাতির কাছে এই সংবাদ দিও যে, যদি তাদের মধ্যে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে কোন দুঃখ স্পর্শ করে তবে খোদার সমীপে তোমাদের কোন অজুহাত কাজে আসবে না। এতটুকু বলেই সাআদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫০১)

বদরের যুদ্ধের সময় আঁ হযরত (সা.) যখন সাহাবাদের নিকট পরামর্শ চাইছিলেন, তখন এক আনসার সাহাবী বললেন: আমরা মূসার অনুসারীদের ন্যায় আপনাকে একথা বলব না যে, اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ অর্থাৎ তুমি এবং তোমর প্রভু শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেড়াও। আমরা তো এখানেই বসে থাকব। বরং আমরা আপনার ডানেও লড়ব বামেও লড়ব, আগেও লড়ব পিছনেও লড়ব। হে রসুলুল্লাহ্! শত্রুরা যতক্ষণ আমাদের মৃতদেহের উপর না যায় তারা আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না বা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। হে রসুলুল্লাহ্! যুদ্ধ তো এক সাধারণ বিষয়। এখানে অনতিদূরেই রয়েছে সমুদ্র। আপনি আদেশ করুন! সমুদ্রে নিজেদের ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। আমরা নিঃসংকোচে নিজেদের ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

এই ছিল সেই আত্মোৎসর্গ ও নিষ্ঠার নিদর্শন যার উদাহরণ অতীতের কোন নবী উপস্থাপন করতে পারে না। মূসার সঙ্গীদের উদ্ধৃতি তারা নিজেরাই দিয়েছে। ইঞ্জিল সাক্ষী রয়েছে যে র হযরত মসীহর শিষ্যরা শত্রুদের সামনে কোন্ দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। একজন তো সামান্য কয়েক টাকার বিনিময়ে নিজের গুরুকে বিক্রি করে দিয়েছে। অপরজন তাঁর উপর অভিসম্পাত করেছে আর অবশিষ্ট দশ জন তাঁকে ফেলে পালিয়েছে। কিন্তু মহম্মদ (সা.) এর সঙ্গীরা কেবল দেড় বছরের সাহচর্যেই ঈমানী শক্তিতে এমনই বলীয়ান হয়ে উঠেছে যে, তারা তাঁর আদেশে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়তেও প্রস্তুত ছিল।"

(নবীয়োঁ কা সরদার, পৃ:)

আঁ হযরত (সা.) সাহাবাদেরকে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদাচারী হওয়ার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাহাবারা নিজেদের প্রিয় নবীর কথা কিভাবে মেনে চলতেন তার দৃষ্টান্ত দেখুন।

"সাহাবাদের প্রকৃতি এমন ছিল যারা নিজেদের প্রিয় প্রভুর প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ করার বিষয়ে উন্মাদনা রাখতেন। তাঁরা আঁ হযরত (সা.) এর এই উপদেশটি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেছেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অমিল। সেই কয়েদীদের মধ্য থেকে এক কয়েদীদের ছিল আবু আজীয বিন উমায়ের এর মৌখিক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) এর আদেশের কারণে আনসাররা আমাকে রুটি বানিয়ে খাওয়াতেন আর নিজেরা খেজুর বা এই ধরণের কিছু খেয়ে কাটিয়ে দিতেন। আর অনেক সময় এমনও হত যে, তাদের কাছে রুটির ছোট টুকরো থাকলেও নিজেরা না খেয়ে আমাকে দিতেন। আর যদি আমিও লজ্জাবশত ফিরিয়ে দিতাম তবে তারা পিড়াপীড়ি করে আমাকেই দিয়ে দিতেন। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৬৫)

" আঁ হযরত (সা.) বন্দীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের বিসয়ে এমন তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন যে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহাবারা নিজেদের পরনের জামা খুলে বন্দীদের, হ্যাঁ তাদের রক্ত পিপাসু বন্দীদের দিয়ে দিতেন। নিজেরা শুকনো খেজুর খেয়ে দিন কাটিয়েছেন আর তাদেরকে রুটি সেঁকে খাইয়েছেন। নিজেরা পায়ে হেটেছেন আর তাদেরকে বাহনে বসিয়েছেন। পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মাঝে কোন যুগেও কি এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়?"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪১১)

ভালবাসার কিছু অনন্য গাথা শুনে নিন।

হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের আনসারী (রা.) এর বিষয়ে রেওয়ায়েত আছে যে, তিনি অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় মানুষ ছিলেন। একদিন লোকেদের মাঝে বসে হাসিঠাট্টার কথা বলছিলেন, এমতাবস্থায় আঁ হযরত (সা.) তাঁর পার্শ্বদেশে (ভালবেসে) লাঠি দিয়ে খোঁচা মারেন। এতে সে বলল, হুযুর আমি তো এর প্রতিশোধ নিব। হুযুর (সা.) বললেন,বেশ চলে এস, প্রতিশোধ নাও।' তিনি বললেন, 'হুযুর আপনি তো কামিস পরে আছেন আর আমি আছি খালি গায়ে। একথা শুনে হুযুর শোধ দেওয়ার জন্য নিজের কামিস উপরে তুলে ধরেন। উসায়েদ বিন হুযায়ের হুযুর (সা.)-কে জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁর পবিত্র দেহে পরপর চুম্বন করতে থাকেন আর বলতে থাকেন, হুযুর! এটাই আমি চাইছিলাম। (আমি তো আশিস অন্বেষণের জন্য মনে মনে এই ফন্দি এঁটেছিলাম)

(হাদীকাতুস সালেহীন, হাদীস নম্বর-৭২)

প্রসঙ্গত উসায়েদ বিন হুযায়ের অউস গোত্রের বনু আব্দুল আশহাল পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং তিনি বরিষ্ঠ সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা বুআস এর যুদ্ধে অউস গোত্রের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। উসায়েদ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, আনসারদের মধ্য থেকে তিন ব্যক্তি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে অনবদ্য ছিলেন। সেই তিন জন হলেন, উসায়েদ বিন হুযায়ের, সাআদ বিন মুআজ এবং আব্বাদ বিন বিশর। আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, উসায়েদ একজন উঁচু মানের সাহাবী ছিলেন। হযরত আবু বাকার (রা.) উসায়েদকে অনেক সম্মান করতেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২২৯)

আল্লাহ তা'লা সাহাবাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, কেননা তাঁরা নিজেদের ঈমানের দাবি পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বয়আতের দাবি পুরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

(মনসুর আহমদ মসরুর)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْن

নামায ধর্মের স্তম্ভ।

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

Vol-8 Thursday, 27 July-3 Aug, 2023 Issue No.30-31

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

করবেন না। তেরো শত বছর পর এ যুগ এসেছে এবং ভবিষ্যতে এ যুগ কিয়ামত অবধি আর আসবে না। এই ঐশী আনুকুল্যেরর জন্য কৃতজ্ঞ হোন কারণ কৃতজ্ঞতা আরো আশীর্বাদ নিয়ে আসে। (খুতবাতে নূর, পৃ: ১৩১)

শ্রোতামণ্ডলী!

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তিনি খিলাফত ব্যবস্থাপনাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বারবার জামাতের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তিনি জামাতের মধ্যে এই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যে খিলাফত ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা প্রণীত। মানুষের কল্পনায় কেউ খলীফা হতে পারে না। খিলাফতের ব্যবস্থাপনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য খিলাফতের অস্বীকারকারীরা যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে সব ষড়যন্ত্র রচনা করে, তিনি তাদের সব ধরণের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ ও নিস্ফল করে দিয়েছিলেন।

তাঁর খিলাফতকালে ইসলামের প্রকাশনার যে মহান কাজগুলি পরিণতি পেয়েছে, সেগুলি আসলে জামাত আহমদীয়ার ঐশী ও জাগতিক অগ্রগতির ভিত্তিপ্রস্তর ছিল। যেগুলির মধ্যে মাদ্রাসা তালীমুল ইসলাম এবং বোর্ডিং হাউসের সুদৃশ্য ইমারত স্থাপনা, মসজিদ নূর- এর ইমামত প্রস্তুত, নূর হাসপাতাল নির্মাণ, মাদ্রাসা আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা, নূর এবং আলফযল পত্রিকার সূচনা, সিলসিলার উপদেশকবৃন্দের দ্বারা ভারতব্যাপী প্রচার, লন্ডনে ইসলামি মিশনের প্রতিষ্ঠা লাভ এবং সেখানে খাজা কামাল উদ্দীন এবং চৌধুরী মহম্মদ সাহেবের পদার্পণ- এরকম অসংখ্য অসাধারণ কৃতিত্বের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। তাঁর এই মহান খিলাফতকাল।

শ্রোতামণ্ডলী!

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) একদিকে যেমন তাঁর এই সুমহান খিলাফতকালে কুরআন এবং হাদীসে পঠন পাঠনের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন, অপরদিকে তেমনি খিলাফতের বিষয়টি বক্তৃতা এবং খুতবার মাধ্যমে বার বার জনসাধারণের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। ফলত জামাতের অধিকাংশেরই সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'লার সাথে দৃঢ়তা লাভ করেছিল। তিনি ১৩ই মার্চ ১৯১৪ ইং সালে জুমআর দিন পরলোক গমণ করেন, এবং বেহেশতি মাকবেরা কাদিয়ানে আপন প্রভুর পাশে সমাহিত হন।

(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)

اے خدا بر تربت او بارشِ رحمت ببار
داخلش کن از کمالِ فضل در بیت النعیم

(খুতবার শেষাংশ.....)

রিজাইনা জামা'তের স্থানীয় প্রেসিডেন্ট হাবিবুর রহমান সাহেব বলেন, জামা'তের একান্ত নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। সদা হাস্যবদনে থাকতেন। আমি কখনো তাকে রাগ করতে দেখি নি। খুব বিনম্রভাবে ও ভালোবাসার সাথে কর্মীদের থেকে কাজ আদায় করতেন। সেবার কারণে কখনো ক্লান্তিভাব দেখি নি। মনে হতো, তার মাঝে সর্বদা আপন প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের এক উম্মাদনা বিরাজ করতো। খিলাফতের প্রতি ঐকান্তি ক ভালোবাসা ছিল।

প্যারুগুয়ের একজন নবদীক্ষিত ইলিয়াস অলিভার সাহেব বলেন, তার সাথে আমার অল্পকিছুদিনের পরিচয়। কিন্তু এই স্বল্পসময়ে তিনি আমার ও আমার বন্ধুদের জন্য এক মহান উত্তরাধিকার রেখে গেছেন অর্থাৎ তাদের জন্য যারা ইসলামে নবাগত। তার কাছ থেকে আমরা ধৈর্য শিখেছি, আমরা সর্বদা সাহায্যকারী, দয়াশীল ও উত্তম মানুষ হওয়া শিখেছি। তিনি আরো বলেন, মরহুম আমাদেরকে শিখিয়েছেন, কাউকে কিছু শেখানোর জন্য মুখে বলা আবশ্যক নয় বরং কার্যত সেবার মাধ্যমেই এ কাজ আমরা সম্পন্ন করতে পারি। (শেখানোর জন্য মুখে বলা আবশ্যক নয় বরং সেবার বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করো, এর ফলে লোকেরা শিখতেও পারে, তবলীগও হয়ে যায়)। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্র তি দয়া ও ক্ষমাসূলভ আচরণ করুন এবং তার সন্তানদের ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন এবং তার পূণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

আরেকজনের স্মৃতিচারণ করছি, তিনি হলেন রানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব। যিনি জামা'তের মুরব্বী ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি রানা আতাউল্লাহ্ খান সাহেবের সুপুত্র ছিলেন। এপ্রিলের শেষদিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার দাদা রানা আলাদ্দীন সাহেবের মাধ্যমে হয়, যিনি ১৯৩১ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র হাতে বয়আত করেছিলেন। বয়আতের পর তাকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই বিরোধিতার কারণে অনেকে ধর্মত্যাগ করেছিল। অর্থাৎ তার আত্মীয়স্বজন মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তিনি আহমদীয়তের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তবলীগ অব্যাহত রাখেন। রানা জাফর উল্লাহ্ সাহেব ১৯৮৭ সনে জামেয়া পাশ করেন এবং এরপর একাধারে ৩৬ বছর পর্য ন্ত তিনি সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বেশিরভাগ সময় তিনি মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন এলাকায় মুরব্বী হিসেবে সেবাদানের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

সৈয়্যদ নিয়ামত উল্লাহ্ সাহেব আফগানী, যিনি বর্তমানে ঘানার মুরব্বী, তিনি বলেন, পেশাওয়ারের অচিনী পায়া– যেখানে আমরা আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে এসেছিলাম, মরহুম সেখানে মুরব্বী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এটি সম্ভবত ১৯৯৯ বা ২০০০ সনের কথা হবে। নিতান্ত ই সাধাসিধে এবং অত্যন্ত বিনয়ী ও দরবেশ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কঠোর পরিশ্রশী ও মানবদরদী মানুষ ছিলেন। আফগানিস্তান জামা'তের প্রতি তার অনেক বড় অনুগ্রহ রয়েছে। তিনি বলেন (সৈয়্যদ নিয়মত উল্লাহ্ সাহেব), আমরা আফগানিস্তানের যে তিনজন মুরব্বী রয়েছি, তার কল্যাণেই আল্লাহ্ আমাদের মুরব্বী বানিয়েছেন।

দরিদ্রদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন, গোপনে দরিদ্র দের সাহায্য করতেন। তার সহধর্মিনী বলেন, তার মৃত্যুর সংবাদ শুনে অনেক এমন নারী-পুরুষ সমবেদনা জানানোর জন্য বাড়িতে আসেন যাদেরকে আমরা কেউই চিনতাম না। তারা একারণেও চিন্তিত ছিলেন যে, মুরব্বী সাহেব আমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাতা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। নিজের আত্মীয়স্বজন ও কিছু দানশীল ব্যক্তিবর্গে র নিকট থেকে অর্থ কড়ি নিয়ে তিনি দরিদ্রদের দিতেন। তার মৃত্যুর পর এখন আমাদের কী হবে? তার জামাতা যিনি জামা'তের একজন মুরব্বী, তিনি বলেন; রানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান সাহেবের মত নিঃস্বার্থ মানুষ আমি অনেক কম দেখেছি ! তিনি বলেন, আমি কোনো প্রকার আত্মম্ভরিতা ও অহংকার তার মাঝে কখনো দেখি নি। ক্ষমা করার ক্ষেত্রে সর্বদা এগিয়ে থাকতেন। ভুলটা অপরপক্ষের হলেও তিনিই প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিতেন। অত্যন্ত স্নেহশীল এবং সদা অন্যের উপকারে আসতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তি নি মা এবং স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং (তার প্রতি) দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন। (আর) তার সন্তানদেরও তার পূণ্যকর্মসমূহকে অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন (আমীন)।

(১০ পাতার পর....)

ছবিও দেখানো হয়। এই শান্তি সম্মেলনে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ারের প্রচেষ্টা এবং বিশ্বশান্তির জন্য সোনালী নীতি সংবলিত একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। এই তথ্যচিত্রে জামাতের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের বিবরণও তুলে ধরা হয়। অনুরূপভাবে নয়া দিল্লীর স্বামী সুশীল মহাশয়ের সঙ্গে ইসলামাবাদে হুযুর আনোয়ারে সাক্ষাতের পর তিনি যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তার সাক্ষাতকার এম.টি.এ সংবাদে প্রচারিত হয়েছিল, সেই সাক্ষাতকারটিও তথ্যচিত্রে দেখানো হয়। অনুরূপভাবে ২০২২ সালে হুযুর আনোয়ারের যুক্তরাষ্ট্র সফরের প্রধান প্রধান অংশ এবং সফরকালে বিভিন্ন খুতবার মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিও তুলে ধরা হয়। এই পিস সিম্পেজিয়ামে জামাতে আহমদীয়ার প্রতিনিধি হিসেবে জামাতের আমুরে খারজার ভারপ্রাপ্ত নাযের সাহেব তাঁর ইংরেজি ভাষণে পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি

সম্পর্কে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর হুযুর আনোয়ারের বিভিন্ন ভাষণের সংকলিত উদ্ধৃতির আলোকে সামাজিক স্তরে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম দ্বারা উপস্থাপিত শিক্ষা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়। অনুরূপভাবে 'বিশ্ব-সংকট ও শান্তির পথ' পুস্তকের পরিচিতও তুলে ধরা হয় এবং এই পুস্তকটি পাঠ করার এবং পুস্তকে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আমল করার বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অ-আহমদী অতিথিদেরকেও নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়। তারা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার সময় শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জামাতের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এরপর অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হলের এক কোণে জামাতীয় বই পুস্তকের একটি স্টল বসানো হয় যা থেকে অতিথিরা অনেক উপকৃত হয়েছে। অতিথিদেরকে জামাতীয় লিটারেচর এবং স্মারক দেওয়া হয়। শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারীরা অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন তারা একথাও ব্যক্ত করেন যে, এই ধরণের অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে। দিল্লীর বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং নিউজ চ্যানেলে এই অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রচারিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা এর শুভ ও সুদূরপ্রসারী পরিণাম প্রকাশ করুন। আমীন।

(কে.তারিক আহমদ, ইনচার্জ, প্রেস এন্ড মিডিয়া, ভারত)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir